কলকাতার মহাদাঙ্গার চাক্ষুষ বিবরণ

কৃষ্ণ ষোলই

মীজানুর রহমান

কৃষ্ণ ষোলোই

কলকাতার মহাদাঙ্গার
চাক্ষুষ বিবরণ

কৃষ্ণ ষোলোই

মীজানুর রহমান

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

কৃষ্ণ ষোলোই

মীজানুর রহমান

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট : ৫৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কম্প্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : মেঘদূত। বর্ণবিন্যাস : ইমারত কম্পিউটারস, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : নুরজাহান বেগম। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

Krishna Sholai by Mijanur Rahaman. Published by Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Basemant : 55, Concord Emporium Shoping Comoplex, 253-54 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205. Design : Meghdut. Computer : M.D Elias, Emarat Computer, 34 Northbrook Hal Road, Dhaka-1100. Copyright : Nurjahan Begom. Date of Published : February 2013.

Price Tk. 150.00 Only. US $ 5.

ISBN 984-70000-0219-8

মা
কাজী খুরশিদা খাতুন
রক্তলাল কালো দিনগুলোতে
সন্তানদের যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখে
তরাসে সময় কেটেছিল যাঁর
আর
ঐ তরাসে কালকে জান কবুল ক'রে
নিবারণ করেছিলেন যিনি
সেই অকুতোভয়
পুণ্যকৃত
শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ
মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে
নিবেদন করলাম

আমার কাগজে যখন লেখাটা বেরোচ্ছিল তখন অনেকেরই এটার গ্রন্থরূপের একটা তাগাদা ছিল। উৎসাহ থাকলেও একটু যে ঘষেমেজে পাতে দেব, সেই সুশীল সময়টা বের করে উঠতে পারছিলুম না। গা-জোয়ারি কিছু আমার ধাতে সয় না। যখন দেখলুম সময়ের জ্যাঠামো থেকে বাঁচার উপায় নেই, তখন কাগজের পাতা থেকে সরাসরি পাঠকদের কাছে তুলে দিলুম বিনে সংস্কারেই।

এক পনেরো বছরের সর্ববৃত্তান্তদর্শী বালকের স্মৃতিচারণা— সিংহভাগ 'বাহাদুর এক্সারসাইজ বুকে' লেখা *গৃহযুদ্ধে কি দেখিলাম* শীর্ষক তাৎক্ষণিক স্মৃতিচারণা ও ১৯৪৬-এর দিনলিপি থেকে, বাকিটা সুন্দরীভবনে জমাবন্দি ধূসর কলরব।
মাঝে মাঝে একালের আমি উটকো হাফ পেন্টালুন পরা ঐ বালকের এলাকায় ঢুকে পড়েছি, এ ব্যাপারে আপনাদের ক্ষমাগুণই একমাত্র ভরসা।

মীজানুর রহমান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার কাছে যখন কারো অনুরোধ আসে : আপনার পুরানো দিনের কথা কিছু বলুন, তখন শেকল-কাটা চুনুরী অতীতের পাশে নন্দিভৃঙ্গীরাও দেখা দেয়— কালো উনিশ শ' ছেচল্লিশ মুখ ব্যাদান করে তাকায় তিরিশ ও চল্লিশের দশকের পৈথানের সুখী কলকাতার পানে।

তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল তেমন প্রত্যক্ষ নয়, জয়নুলের কাকেরা ডাস্টবিনে নিশ্চিন্ত— যুদ্ধের যা-কিছু পাঁয়তারা তা ঐ খবরের কাগজের পাতায়, প্রেক্ষাগৃহে দেখানো ইন্ডিয়া নিউজ রীলের ছবিতে। মোটা বালাম ৩ টাকা ৩৷৷ মন এবং বাঁসমতি জাতীয় ভালো চালের মন ৪/৫ টাকা দরে বিকতো। মেসগুলোর কেরানিবাবুরা মাসকাবারি ৬/৭ টাকায় থাকা-খাওয়ার পাট চুকিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতেন। চলচ্চিত্র জগতে কানন-বড়ুয়া-সায়গল এবং অশোক কুমার-দেবীকা রানি-লীলা চিটনিসের ভারি দাপট। দেয়ালির সময় রাতের আকাশে কতো না মনমোহন ফানুশের আনাগোনা, কতো না বিচিত্র রঙের ঢঙের ঘুড়ির খেলা। সাহেব পাড়ায় কি গড়ের মাঠে বড় দিনের জাঁক-জৌলুশ দেখে অজ্ঞাত কবির পঙ্‌ক্তি মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে :

'হায়রে সুখের দিন শোভা কব
কায়?
ইংরেজটোলায় গেলে নয়ন
জুড়ায়।'

আর আমাদের ছোটদের জন্যে যেমন ছিল মহানন্দ ঈদ, ঈদের বাড়া মিত্র স্কুলের সরস্বতী পুজোয় সতীর্থ সুনীতি, গগনদের সহযোগে একপাতে স্বাদুতা-বিহীন-স্বাদু বেগুন পোড়া, সাঁজো সাঁতলানো পাঁপড় ভাজা, শশী যথা ফুলকো লুচি, পাঁচফোড়নের অলৌকিক গন্ধমাখা লাবড়া, মৌরি ও কালোজিরা সাঁতলানো কচুরি কি পকৌড়ি, নারকোলের নাড়ু, দ্বারিকের দই, ভীমনাগের সন্দেশ কি কে. সি. দাশের রসগোল্লা সেঁধোনো, আর কানাইবাবু স্যারের হাঁকাহাঁকি : 'কাড়াকাড়ি ক্যানো র‍্যা? কিষেণ, অ্যাই কিষেণ! ওর পাতে আরো দুখানা পাঁপড় দে। এই যে চাটুজ্জে মশাই, এবার লুচির ভার নারা'ণের ওপর, কেমন লাগচে বলুন, ভালো? আরো, দিই? নাহ্?' জোড়াসনে বসা বাবার দিকে তাকিয়ে— রহমানদা মাঠে তো খুব পা চলে— মুখ চলছে না কেন? সীতে, তুই ওদিকটা দ্যাখ।'

আর আমরা তখন কোথায়, কোন্ পল্লীতে?— একে একে ডায়মন্ড হারবার, বৈঠকখানা, পাটোয়ার বাগান, কালী সোম স্ট্রিট, বৌ বাজারের বাসাবাড়ির সম্পর্ক

চুকিয়ে বানভাসি আমাদের পরিবার তখন গড়পারের বাসড়িয়া। এমন একটা পল্লী যার ত্রিসীমানায় কোনো মুসলমানের বসতি ছিল না। এই যে বলা হলো বিশেষ সম্প্রদায়ের বসতির কথা, কি আশ্চর্য এ-উপলব্ধি ঐ বালক-মনে কিন্তু এভাবে আলাদা খণ্ডিত আকারে কখনো অনুভবে আসে নি। কারণ কথাটি হলো, আমার আশেপাশে যে অনেক লোকের ভিড় : মাসিমা, ওঁর মেয়েরা, অমলা, কমলা, বিমলা, আরতি ওদের বাবা ধিনিকেষ্ট উকিল কাকা, সন্ধ্যে হলে কাঁসর ও উলুধ্বনি আর অমলা-কমলাদির সারগম সাধা, আইবুড়ি নাম ঘুচিয়ে পাতি-মৌড় সাজে অমলাদির সাতপাকে বাঁধা-পড়া, গাঁট-ছড়া-বাঁধা অমলাদি ও ননুয়া গা জামাইবাবুর বেলতলায় পুজো দিয়ে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, তাপ্পরে উলু, তাপ্পরে শাঁকের ভেঁপু, গুরুজন সহ সমবেত ক্রন্দন, সবশেষে জোড়ে যাওয়া। এ সবেতে যোগ দেয়া আনন্দ লোটা— কই মানা তো ছিল না। মানা যা ছিল সেটা আরতিদের— আর ওটা তো ওদের ধর্মবিশ্বাসের এলাকা। এই যেমন আরতি বিমলারা ছিল বামুন, বামুনের মেয়ে মুসলমানদের ঘরে খায় কি করে— তা খায় লুকিয়ে, আমাদের বাড়ি খেলতে এলে খায়। পিঠেপুলি হলো তো আরতি, ভালো একটা খাবার হলো তো আরতিই— কিশোরী বিমলারও কি ইচ্ছে হতো না— হতো, কিন্তু বয়সের যা দোষগুণ— খায় না, কিসে কি হবে বলা তো যায় না।— দিদিদের বিয়ে হচ্ছে না এ তো চোখেই দেখছে! তাই হঠাৎ ওর সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে ধরা পড়লে বালিকা আরভি ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপত। আর খাবে না এমন একটা মা-কালীর দিব্বি সে প্রতিবারই দিত! ওদের বাড়ি খেলতে গেলে, সন্ধ্যেবেলা খেলা শেষে শান-বাঁধানো উঠোনসহ অপবিত্র সারা বাড়ি ধোয়ামোছা চলত আর ঐ ভরসন্ধেয় গামছা পরে আরতিরা ঢুকত উঠোনের স্নানঘরে— গা-ধুয়ে তবে না অন্দরে প্রবেশের অনুমতি! এসব ভাবাত বৈকি— তবে বালকের মনে স্থায়ী হতো না ওটা।

কি করে স্থায়ী হবে, ফি রোববার আসবেন যে কাকাদের ঝাঁক— ফণি কাকা, শৈলেন কাকা, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় খালেক কাকা, চুনী কাকা, শিবেন কাকা, কমল কাকা (খ্যাতনামা ক্রিকেট ভাষ্যকার)— আর আসা মানেই বাড়ি গুলজার। বৌদির (অর্থাৎ আমার মায়ের) হাতের পোলাও, কোর্মা, কালিয়া— খুব গোপালগাদন চলত, চলত গপ্পের ভুষুড়ি ভাঙা, ব্রিজ অথবা গ্রাবুখেলা আর থেকে থেকে মহা ঘটারোল! আরো মজা— ঝড়-জলে কারো বাড়ি কাপড় ছেড়ে আসলে কি কোনো ব্যবহার্য জিনিস ভুলে রয়ে গেলে ওটা আর ফিরিয়ে দেয়ার রেয়াজ ছিল না। এমনি করে বাবার গরদের জোড় যদি শিবেন কাকার বাড়ি তো ওঁর সখের শেফার্স পেন বাবার জিম্মায়, কিংবা শৈলেন কাকার হাতঘড়ি চুনীকাকার হাতে শোভা পাওয়াটা অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না। পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি গেলে কাকাবাবুদের স্নেহ পেছন পেছন ছুটত! পার্সেল যোগে পাঠিয়ে দিতেন কেউ আমাদের অজপাড়াগাঁয়ে কে. সি. দাসের রসগোল্লার চিত্তরঞ্জিনী প্যাকেট, কেউ বা শিশুতোষ আর কোনো উপহারের ডালি। ভূপাল কাকা সুদূর হাওড়া থেকে বাড়ি বয়ে গান শিখিয়ে যেতেন বোন গীতিকে। তাছাড়া প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে শৈলেন কাকাকে দেখেছি তো বড় ভাইকে কতো না যত্ন করে অঙ্ক শেখাতে। আর সবার ওপরে যিনি, কলকাতার মহাদাঙ্গায় আমাদের

সমগ্র পরিবারকে যে মহাত্মা শত বিপদ উপেক্ষা করে আগলে রেখেছিলেন, তিনি হলেন ভারত-বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ প্রাতঃস্মরণীয় বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়।

মনে পড়ে, একবার সরস্বতী পুজোয় দাঁড়িয়ে আছি স্কুলে পুজোর দালানে দরজার পাশে,— পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন, সমবেত ভক্তকুল ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দ তাই শুনছেন। পূজারীদের মাঝে আমাদের কমলবাবু স্যারও আছেন। আমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃদুস্বরে ওঁর পাশে বসতে আজ্ঞা করলেন। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম— চট করে ওঁর পাশে বসে পড়ি— আমার জায়গাটিতে। যজ্ঞোপবীতধারী পুরোহিতের মুখে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ ঈদের নামাজে ইমামের মুখে উচ্চারিত আরবি স্তোত্রপাঠের মতোই অবোধ্য ঠেকলেও বর্ণাঢ্য ঐ মহাসম্মিলনে সতীর্থ ও গুরু মশাইদের সঙ্গে নিষিদ্ধ আনন্দের ভাগ পেয়ে সেদিন হরষের আর অবধি ছিল না।

তবে আমাদের মিত্র স্কুলের নিস্তরঙ্গ জলে মাঝেমাঝে ঢিল ছুঁড়ে পরিবেশ ঘোলা করার ঘটনা একেবারে ঘটত না, বলবো না। এই যেমন আশু বাবু। একবার হলো কি নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে 'নেড়ে' সম্বোধন করে বসলেন এবং কোমলমতী বালকদের কাছে নবাবের নারীর পেট চিরে বাচ্চা দেখার মতো নিষ্ঠুর বিতর্কিত প্রসঙ্গ টেনে আনতেও তাঁর জিভ আটকাত না। আমি হেডমাস্টার পঞ্চানন বাবুকে অভিযোগ করলে তিনি আশুবাবু স্যারকে আচ্ছা করে ডেঁটে দিয়েছিলেন। অবশ্যি এর জন্যে আমার কপালে কিছুদিন পড়া না পারার কারণে স্ট্যান্ড আপ, নীল ডাউন ও রামগাট্টা মন্দ জোটে নি!

আরেকবার হলো কি, আমাদের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অগ্রজ মঈদ-উর-রহমান তাঁর একাঙ্কিকা 'মেঘনাধ' পরিবেশন করতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলেন। মধুসূদনের প্রভাবে অগ্রজের মেঘনাধ এখানে বীর-পুজো পেয়েছেন। কেউ অভিনয় করবে না, সহযোগিতা তো নয়ই। এগিয়ে এলেন তাম্বুলরাগ রঞ্জিত দাশু বাবু স্যার— বিচিত্রানুষ্ঠানের কর্ণধার। নাটকটা ভালো, কাজেই বড় ভাইকে অভয় দিয়ে বললেন, "হ্যারে মঈদুর, পারবি একা অভিনয় করতে? তোকে যে পারতেই হবে রে! আমি তোকে তৈরি করে নোবো। তোর একাঙ্কিটা উৎরেছে জবর— হার মানি কি করে।" বড় ভাইও স্যারের জেদের ফলে উৎসাহিত হলেন। চলল একক জোর মহলা। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সাম্প্রদায়িক অংশটিও নীরব রইল না— যাতে একাঙ্কিকার একক অভিনয় না ঘটতে পারে সে ব্যাপারে চলল জোর প্রচার। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যত ঘনিয়ে আসতে লাগল উত্তেজনাও বাড়তে লাগল সমান তালে। কিন্তু মজা কি, অগ্রজ যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যখন নিজের লেখা 'মেঘনাধ'-এর একক অভিনয় শুরু করলেন তখন যেমন ছিল পিন-পতনের নীরবতা শেষ করলেন কিন্তু করতালির মাধ্যমে! এইভাবে শুভবুদ্ধির জয় হলো!

আমার এও মনে পড়ে, বাবার অনেক বন্ধুর এক বন্ধু বিখ্যাত নটবর জহর গাঙ্গুলীর কথা। জহরবাবু ছিলেন মোহনবাগানের পাঁড় সদস্য, বাবা জায়ান্টকীলার এরিয়ান্স ক্লাবের, আর নিজ আপিস ট্রপিক্যাল স্কুল ক্লাবের তো ছিলেন প্রাণপুরুষ। একবার হলো কি জহরবাবু অভিনীত এক নাটক দেখে নাট্যভারতী থেকে শো ভাঙার পর বাবা

অপেক্ষমান লাস্ট শো-এর বাসে বাড়ি ফিরছিলেন। অসম্ভব ভিড়ের মাঝে হঠাৎ বাবাকে উদ্দেশ্য করে 'পকেটমার পকেটমার' বলে মহা হুজ্জোতি কাণ্ড! অসহায় বাবা আমার যতো কাকুতি-মিনতি করেন কোনো ফলোদয় নেই। উচক্কা হেঁড়ে গলার 'কে র‍্যা? কোন্ স্লা— ' রাম হাঁক এবং তারপরেই 'একি রহমানদা আপনি!' বলে জামার আস্তিন গুটিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যান বাবাকে জাপ্টে-ধরা ষণ্ডা গোছের লোকগুলোর দিকে। ওরা ঝটিতি বাস থেকে সটকে পড়ল।

'অতো ঘাবড়ালে চলে। দিয়েছিল তো রদ্দা মেরে। তো দেখুন পকেট ঠিক আছে তো?' বাবা নিজের পকেটের আন্দাজ নিয়ে মাথা হেলালে বাবাকে পাশে বসিয়ে জহর গাঙ্গুলী মুচকি মুচকি হাসেন।

আবার এর উল্টো অভিজ্ঞতাও রয়েছে বাবার। ওঁর মুখেই শোনা। অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠমুখো ট্র্যামে যাচ্ছিলেন। ফুটবোর্ডে বিকেলের ভিড়ে বাবা। একটা স্টপেজে ঐ ভিড়ের মাঝে এক বৃদ্ধ ট্র্যামে চাপলেন, পেছনে কন্যা। ততক্ষণে টুনানুং টুনানুং শব্দে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েটি পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, বাবা টেনে না ওঠালে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন এবং এক সময় সিট পেলে নিজেরা বসলেন এবং বাবাকেও বসিয়ে তাঁদের বাসায় চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। কথায় কথায় বাবার নাম জিজ্ঞেস করায় বাবা তাঁর নাম দু তিনবার উল্লেখ করার পরও খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত গৌরকান্তি যুবকের দিকে ফ্যাকাসে মুখে তাকান। নির্বাক বৃদ্ধ— অবিশ্বাস, তিরস্কার ও ঘৃণা— চোখে, কপালের কুঞ্চিত বলিরেখায় এবং একসময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলে 'আয়রে মা' বলে বাবার দিকে আর দৃকপাত না করে বোধকরি গোবর জলের তৃষ্ণায় তড়িঘড়ি নেবে পড়লেন!

তবে বাবা আমাদের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নিতে উপদেশ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা বলেন না। ওঁর মতে :

"এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত রূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আজও আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"

"এই সঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বললাভ করিব— এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় কথা না, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের নিরিখ যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখব আমার দেখা হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারটার মধ্যে ছেলেবেলার নির্দোষ চোখটা কাজ করেছে, যার

কিছুটা বাবা থেকেও পাওয়া। বাবার জীবনের শৈশব ও যৌবনের অধিকাংশ কাল এবং সেইসঙ্গে আমাদের ছেলেবেলাটাও হিন্দু সংসর্গ ও হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কেটেছে— যে কারণে হিন্দু ও মুসলমান যে একটা পৃথক বাস্তব সত্য তা তার স্বরূপে আমাদের জীবনে তেমন করে দানা বাঁধেনি। হয়তো অবচেতন মনে কাজ করে থাকবে এবং এই সত্য কম-বেশি সেকালের শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু সমাজে তা কখনো আন্তরিকতার ঔজ্জ্বল্যে, কখনো বা প্রচ্ছন্ন কপটতার আড়ালে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানদের পৃথক বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথের মতো করে দেখা হয়। ফলে, খবরের কাগজে লোকমুখে ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবর আমাদের মনে তেমন রেখাপাত করত না এবং এর সমাধানের জন্যে সমাজের কেউ তেমনভাবে এগিয়েও আসত না। ফলে বিভাজনের যোগফল মনের মণিকোঠায় দিনের পর দিন অগোচরে সমৃদ্ধ হচ্ছিল। সাহিত্যের ভুবনে বিশেষ করে কথাশিল্পে মুসলমানদের অস্তিত্বহীনতার কথা তেমন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না বালক মনে— কাহিনী বৈভবের গুণে তা আড়ালে বাস করত ; অপবিত্র হওয়ার ভয়ে জলের ঘটি ছোঁয়া যেত না— স্কুলের ছক্কুলাল ওপর থেকে আমাদের হাঁ করা মুখে ঢেলে দিত— এটা খুব স্বাভাবিক ঠেকত, তবে ছোট্ট একটা 'কিন্তু' যোগ হতো না তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না; হ্যারিসন রোডের 'দিলখোশ কেবিন'-এর সাইনবোর্ডের নিচে 'কেবলমাত্র হিন্দুমহাশয়দের জলযোগের উত্তম ব্যবস্থা' এমন একটা উৎকট বিজ্ঞপ্তির কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে কলকাতার লঙ্গরখানাগুলো মা-বাবাহারা অসহায় অবোধ শিশুদের ধর্ম পরিচয় নিয়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে রেজিস্ট্রি খাতায় প্রকৃত ধর্ম গোপন করে স্বধর্মে তালিকাভুক্তির মতো কেলেঙ্কারির বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা— এমন কতো না টুকরো টুকরো ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। এগোলোকে আমরা পাশ কাটিয়েছি অর্থাৎ বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছি।

কিন্তু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ সরকার এই বাস্তবতার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল ওদের মতো করে— যা উদোম হয়েও হিন্দু-মুসলমানদের চোখে রাজার পোশাক পরার মতোই ছিল মহা সত্য, এই স্থূল ব্যাপারটাকে মূলধন করেই ওরা অর্থাৎ ইংরেজরা মাঠে নামল বিভেদ নীতির কূটচালকে সামনে রেখে। এবার হিন্দু-মুসলমানের পৃথক সত্তা নিয়ে ইংরেজদের কূটচালের সেই বিবরণ। বড়লাট লর্ড কার্জন এ ব্যাপারে অগ্রদূতের কাজটা করলেন। তিনি বুঝেশুনে ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে বড় অস্ত্র হিসেবে devide and rule এই বিভেদ নীতি প্রয়োগ করে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি এর বিরুদ্ধে সে সময় একাট্টা হয়ে লড়াই করেছিল। কূটকচালে কার্জন হিন্দু-মুসলমানদের দুর্বলতার খবরটা জানতেন, কাজেই মুসলমানদের সপক্ষে আনার জন্যে ঢাকায় গিয়ে প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, বঙ্গভঙ্গের দ্বারা মুসলমানদের জন্যে নিজ অভিরুচি অনুসারে চলার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক প্রদেশের সৃষ্টি করাই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। একে একে যাঁরা একসময় বঙ্গভঙ্গের (অর্থাৎ পার্টিসনের) বিরোধী ছিলেন, যেমন, নবাব সলিমুল্লা ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমান, তাঁরাও কার্জনের অনুকূলে চলে যান। এসব লক্ষ করেই

হিন্দু-মুসলমানের হাতে রাখী-বন্ধন পরাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

'আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্প দিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিসান-ব্যাপারে [অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন] আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছিল ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি বস্ত্র হরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা যেমন করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল। .....'

"কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবন ধারণ করে না ; তাহার কারণ মানুষের কেবল শরীর জীবন নহে।"

"এই-যে বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই, ইংরেজদের শাসন হইতেই ঘটিত, তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু-মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করেতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে, আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত হিত চেষ্টা পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সংকলন/১৩৬০ সংস্করণ, পৃ. ৬০-৬২)

আরেক স্থানে বলেছেন : "বঙ্গ বিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।.... হিন্দু-মুসলমানদের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছ যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। (লোকহিত, পৃ. ২৬০, রবীন্দ্র রচনাবলি ২৪তম খণ্ড)

যেহেতু মনটা খণ্ডিত, তাই এক হওয়ার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলোও একে একে নস্যাৎ হয়ে গেছে। আমার এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, (নাম মনে নেই, হতে পারে 'লালমাটি')। এই উপন্যাসে রুটির চেয়ে উচ্চতর

খাদ্য জোগাতে অসমর্থতাই যে দেশ বিভাগের কারণ তা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে কাহিনীটা এরকম : পাকিস্তান-এর সমর্থনে মুসলিম লীগের সভা হবে। কংগ্রেস কর্মীরা হতে দেবে না ঐ সভা। একটা গোলমাল পাকিয়ে ভণ্ডুল করবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমান এক কংগ্রেস কর্মীর ওপর মুসলিম পল্লীতে গিয়ে ওদের অভিসন্ধি শলাপরামর্শ একটু জেনে আসার ভার পড়ল।

গভীর রাত। কংগ্রেস কর্মীরা সবাই অপেক্ষা করছে গোপন আড্ডায় কখন মাস্টার সাহেব অর্থাৎ মুসলমান ঐ কংগ্রেস কর্মী খবর নিয়ে আসবেন। সবাই উৎকর্ণ— দরজায় সাংকেতিক টোকার শব্দ শোনার জন্যে।

মাস্টার নিঃশব্দে সবদিক দেখেশুনে নিজেকে যতটা পারা যায় আড়াল করে আড্ডাস্থলে এসে হাজির হন। দরজায় টোকা দিতে যাবেন হাত আড়ষ্ট হয়ে যায়, যেন মন্ত্র পড়ে কে তাকে পাথর করে দিয়ে গেল। ঘরের ভেতর তখন কথাবার্তা চলছিল :

— আমরা এত বড়ো একটা স্টেপ নিতে যাচ্ছি, মাস্টারকে না জানিয়ে— এটা কি ঠিক হচ্ছে?

— না, না ওকে সব কথা বলা যাবে না। শত হলেও ব্যাটাচ্ছেলে নেড়ে তো! নেড়েদের বিশ্বাস নেই!

মাস্টার সাহেব যেমন নীরবে এসেছিলেন সেভাবেই চলে যান।

পরদিন সভাভঙ্গের জন্যে অপেক্ষমান যুদ্ধংদেহী কংগ্রেসকর্মীরা অবাক হয়ে লক্ষ করে সভাস্থলে অগ্রসরমান মুসলিম লীগের মিছিলে পুরোভাগে মুসলিম লীগের পতাকা হাতে কে, না তাদেরই একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত কর্মী মাস্টার সাহেব!

সংখ্যালঘুদের মনে সংখ্যাগুরুদের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে অবিশ্বাস ও ভয় তা এভাবেই জন্ম নেয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ যে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন সার্থক হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল, পরম পরিতাপের বিষয় তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৬ বছর পর তাঁর সেই অনুসারীরাই বঙ্গভঙ্গের জন্যে মরণ পণ করতে দ্বিধা করে নি। এবং এই পণ সংখ্যালঘুদের মনে সংখ্যাগুরু সম্পর্কে ভয় ও অবিশ্বাস থেকেই। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এবং শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের যৌথ উদ্যোগে যখন স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গদেশের ধ্যান-ধারণা চলছিল, জিন্না ও কিছুটা গান্ধীর অনুমোদনও যখন হাতের মুঠোয়, বাংলাদেশ কংগ্রেস তা নাকচ করে দেয়। নস্যাৎ হয়ে যায় স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গদেশের স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কি হতো জানিনে, কিন্তু সার্বভৌম বঙ্গভূমির পেছনে তো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবনা ছিল না, তবে কেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় গিয়ে খণ্ডিত ও দুস্থ পশ্চিম বাংলায় গেলেন কংগ্রেস? এ প্রশ্নের জবাব তো পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এই যে ভয় এই যে অবিশ্বাস এটা সম্ভব হয়েছে দ্বীপপুঞ্জের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে থাকার দরুন, মহাদেশের মতো বিস্তৃত ও এক হয়ে উঠতে না পারার অসফলতার দরুন।

এ তো গেল পটভূমি। এখন আমি ঐ যে গোড়ায় কালো ছেচল্লিশের মুখ ব্যাদানের কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গে আসব। মূলত আমার এই রচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই।

১৯৪৬ সাল।

ভারত বিভাগ এড়াবার সব প্রচেষ্টাই যখন থেকে একে একে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছিল সেই অশুভ ক্ষণে ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো ক্যাবিনেট মিশন যেন এক আশার প্রদীপ হয়ে দেখা দিল। অনেক দর কষাকষির পর ১৯৪৬-এর ১৬ই মে ঘোষিত 'ক' 'খ' 'গ'— এই তিন প্রদেশ গোষ্ঠী সম্বলিত (মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে 'ক' প্রদেশ গোষ্ঠী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, ও সিন্ধু 'খ' গোষ্ঠী এবং বঙ্গদেশ ও আসাম নিয়ে 'গ' গোষ্ঠী) এক অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা যখন পাকিস্তান দাবি পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগ এবং আংশিকভাবে হলেও দ্বিজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেস মেনে নিয়েছিল, তখন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাইয়ের এক বিবৃতি অখণ্ড ভারতের মূলে কুঠারাঘাত হানে। নেহেরু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, "কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিবর্তন বা রদবদল করার স্বাধীনতা তার আছে।"

ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনকারী উক্ত অবিমৃশ্যকারী বিবৃতি সম্পর্কে মওলানা আজাদ বলেন, "আমাকে একথা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে জওহরলালের বক্তব্য ভ্রান্ত ছিল। একথা সত্য নয় যে কংগ্রেসের নিজ ইচ্ছানুসারে পরিকল্পনার পরিবর্তন করার স্বাধীনতা ছিল। আমরা প্রত্যুতঃ এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেল ধরনের হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বাধ্যতামূলকভাবে তিনটি বিষয় থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা এ বিষয়েও সম্মত হয়েছিলাম যে 'ক' 'খ' ও 'গ' নামে তিনটি প্রদেশ গোষ্ঠী থাকবে। চুক্তির অপরাপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের পক্ষে একতরফাভাবে এসব ব্যাপারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"

সঙ্গতকারণেই জিন্নাহ্‌র কাছে নেহেরুর বিবৃতি 'আকস্মিক ও বিস্ময়কর' মনে হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন যে, "কংগ্রেস সভাপতি নেহেরুর ঐ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। দিল্লিতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। কারণ দলকে এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, কংগ্রেসও ঐ পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে এবং এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে।

"এখন কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ঐ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনবে। এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কৃপার পাত্রে পরিণত হবে।" কাজেই নেহেরুর দুর্ভাগ্যজনক অদূরদর্শী এই বক্তব্যকে কংগ্রেসের গোপন বক্তব্য হিসেবে ধরে নিয়ে ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল বোম্বেতে বৈঠকে মিলিত হয়ে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং ঐ একই বৈঠকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর পথ বেছে নেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। এ সম্পর্কে মওলানা আজাদ যথার্থই বলেন, '১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা কেবল কলকাতার জন্যেই নয়, বরং সমগ্র ভারতের জন্যেই ছিল এক কালো দিবস।"

এবার আমার নিজের চোখে দেখা কলকাতার সেই রোমহর্ষক কালো দিবস এবং অব্যবহিত দিনগুলোর কথা।

আগেই জানিয়ে দিয়েছি আমাদের পাড়ার কথা— সে তো গড়পার। আমাদের এ পাড়াটি নিয়ে আমাদের ভারি গর্ব। এর উত্তরে মানিকতলা— স্বদেশী আন্দোলনের সময় এখানেই তো ধরা পড়েছিলেন বিখ্যাত 'মানিকতলা বোমা মামলা'র বারীন ঘোষ, কানাইলাল ও উল্লাস কর। এর ধারেকাছেই ছিল বত্রিশটি ভাষায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত হরিনাথ দে মহাশয়ের বাসাবাড়ি, খাস গড়পার রোডের বাসিন্দে ছিলেন কিশোরগঞ্জের স্বনামখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবার : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়, দক্ষিণে উজিয়ে সমৃদ্ধ ব্রাহ্ম লাইব্রেরি ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (এখানেই পড়ত আমার দু'বোন), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দির, অদূরে 'পালিত অধ্যাপক' বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়-ধন্য বিজ্ঞান কলেজ আর বিদ্যাসাগরের বাড়িও তো ধারেকাছেই— বিদ্যাসাগর স্ট্রিট ধরে হেঁদোর দিকে একটু এগোলেই জরাজীর্ণ দরজা ও পাঁচিলঅলা বাড়িটা চোখে পড়বে আর ঐ যে ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ— যে-নামে এক ডাকে সবাই চেনে সে তো বিষ্টু ঘোষ— তিনি যে ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। ছোটখাটো ঐটুকু তো লোকটা, কিন্তু কি তাঁর ব্যক্তিত্ব। কি কণ্ঠস্বর! এমনিতে মৃদুভাষী, তবে কিনা ঐ মৃদুল মঞ্জুল ধ্বনির মধ্যে ছিল যেমন স্নেহের আলিঙ্গন, তেমনি বরফের কুচির মতো শাসন।

ওঁর বাড়ি আমাদের তেতলা বাড়ির ঠিক পাশে নয়, মাঝে অমলাদিদের বাড়ি। তারপরে। বিষ্টু বাবুর দোতলা ভবনের পাশেই চেট্টেনেট্টে সবুজ ঘাসে মোড়া একটা মাঠ— চারদিকের পাষাণপুরীর মাঝে ঐ এক রত্তি হরিৎ ভূখণ্ড চোখ জুড়িয়ে দিত। তবে শুধুই মাঠ— গাছপালা নেই, বাগানও নয়— নিরাভরণ এক চিলতে নিরেট মাঠ। আর এটাই তো বিষ্টু বাবুর আখড়া। প্রতিদিন বিকেলে নিয়ম করে এখানে ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ চলত। বিষ্টু বাবু নিজে ছিলেন, আর ছিলেন তাঁর যোগ্য শিষ্য পাঁচ-ছ বার একাদিক্রমে 'ভারত-শ্রী' হবার গৌরব অর্জনকারী মনোতোষ রায়। বিকেল ৪/৫ টার দিকে শিক্ষার্থীরা একে একে জড়ো হতো এই মাঠে। যখন সবাই উপস্থিত হতো তখন মাঠের পুব দিকের দেয়ালে ঠেকনো দেওয়া বেশ বড় মাপের শিবাজীর একটা আবক্ষ ছবির (যেটা প্রতিদিন ব্যায়াম শেষে বিষ্টু বাবুর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হতো) সুমুখে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির শপথ নিয়ে ব্যায়াম শুরু করত। মাঠের পাশে বসে এসব দেখতুম। কিন্তু শিবাজী কেন? শিবাজী সম্পর্কে ইতিহাসের বইয়ে যা পড়েছি এবং বাবার কাছ থেকে যা জেনেছি তাতে ওর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। ঐ ধারণার সঙ্গে বিষ্টু কাকার (সময় গড়িয়ে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ততদিনে) আখড়ার শিবাজীকে মেলাতে পারছি নে। জিজীবাই-শাহজী তনয় শিবাজী অশিক্ষিত হলেও ছেলেবেলায় কথকের কাছে রামায়ণ-মহাভারতটা শোনা ছিল। কাহিনীদ্বয়ের প্রভাবে মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের উদ্ধার ও রাম রাজত্বের স্বপ্ন যদি দেখেই থাকেন তাতে আমি দোষাবহ কিছু দেখি নে, একজন হিন্দু হিন্দুরাজ্য কামনা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। আর সেটা যদি হয় পুনরুদ্ধারের মতো মহান কাজ, তাহলে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওর লুটেরা মনোবৃত্তি এবং ইঁদুরের

মতো (যে কারণে 'পার্বত্য মুষিক' মারহাট্টা 'মুষিক' বিশেষণ) অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সবংশ শত্রু নিপাতের মধ্যে সমর্থন করার মতো কিছু খুঁজে পাই নি। যেহেতু লুটেরার কোনো জাতপাত নেই, তাই ওর দলে মুসলমান লুটেরাদেরও অভাব ছিল না। তাহলে কি বিষ্টু বাবুর আখড়ার যা-কিছু অনুশীলন তা ঐ শিবাজীর আদর্শের পেছনে ছুটছে? তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমনটা মনে হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আলোকিত আধুনিক যুগে শিবাজী-চিন্তা কতটা সিদ্ধ? কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার বালক-মনে বেশিদূর অগ্রসর হতো না। আমার চোখে মনতোষ রায়ের মাংসপেশীর অপূর্ব খেলা বরং অনেক চিত্তাকর্ষক ছিল।

বাবা ছিলেন খেলোয়াড়— মাঠে যেমন, জীবনেও। ফুটবল, ক্রিকেট ও লন টেনিসে নিজ প্রতিষ্ঠান ট্রপিক্যাল স্কুলের হয়ে অফিস লীগে খেলতেন। বাবাদের বাঘা টিম তিরিশের যুগে পর পর কয়েক বছর কোহিনুর, হুইলার ও এলিয়ট শিল্ড এবং কুচবিহার কাপ ছিনিয়ে নিয়েছিল। কাজেই প্রতিবেশী হিসেবে ব্যায়ামবীর বিষ্টুবাবুকে পেয়ে বাবা তো খুশি হবেনই। আর তাইতো ঢুকিয়ে দিলেন ওঁর আখড়ায় অগ্রজ ও আমাকে। বড় ভাই ও আমি ব্যায়ামের কলাকৌশল শিখে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরি। গড়ের মাঠ-ফেরতা বাবা তত্ত্বতল্লাস নেন। কিন্তু বড় ভাই কি যেন বলতে গিয়ে বলেন না। শিবাজীর ছবির সামনে, শপথ নেবার কালে বরাবরই ওকে বড় গম্ভীর দেখেছি। বড় হয়ে বুঝেছি ঘোর অসাম্প্রদায়িক বড় ভাইয়ের ঐ গম্ভীর হওয়ার কারণ। ওর ধর্মনিরপেক্ষ মনে শিবাজী নয় আকবর ছিল আদর্শ। বিষ্টু কাকার মতো এমন সজ্জন— শিবাজী তাঁর আদর্শ হয় কি করে! তাছাড়া তখনকার রাজনৈতিক আলোকে এই শিবাজী ব্যাপারটা হিন্দু মহাসভাতেই মানায় ভালো। একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি ফিরলে বাবাতে বড় ভাইয়ে আখড়া নিয়ে কথা হলো। মাঝে মাঝেই শিবাজী প্রসঙ্গটা আসছিল। পর দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আখড়ার দিকে পা বাড়িয়েছি বড় ভাই বললেন : 'যাস নি। আমিও যাবো না। কোনো দিন না। শিবাজী যেখানে ওখানে আমাদের যেতে নেই।'

তারপর আর যাই নি। বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঠিক আগের মতোই শপথ শুনতুম, ব্যায়াম দেখতুম, বাইসেপ্‌সের ওঠানামা চঞ্চল করত মন, কিন্তু না, আর ফিরে যাই নি নেড়ামুড়ো ঐ হরিৎ ভুবনে।

শুধু বিষ্টুকাকা কেন, সেকালে, স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে খেলাধুলো, লাঠি খেলা ও ব্যায়াম অনুশীলনের আখড়া গড়ে উঠেছিল। খোদ গড়পার রোডেও ছিল এক ব্যায়াম সমিতি তথা আখড়া। বিষ্টু বাবুর আখড়া থেকে খুব একটা দূরে নয়। সঙ্গে ছিল ফুটবল ক্লাব (এটাই পরে প্রথম বিভাগ লীগে গ্রীয়ার ক্লাবে রূপান্তরিত হয়), ক্রিকেট ক্লাব আর ব্যান্ড পার্টি। সমিতিতে লাঠি খেলাও শেখানো হতো, শেখাতেন বিখ্যাত লেঠের পুলিনবিহারী দাস। জিমন্যাস্টিক ও প্যারালাল বার করত পাড়ার সব ছেলেরাই। গড়পারের পুব দিকে বয়ে যাওয়া খালে সাঁতার শিখতে যেত অনেকে। কিন্তু বিষ্টু কাকুর আখড়ার ছেলেদের যে সুনাম ছিল তা কিন্তু বলা যাবে না এদের বেলায়। বিষ্টু কাকুর শিবাজী ছিলেন শুধু পটে আঁকা ছবি, কিন্তু গড়পারের আখড়ার বেলায় ওদের কর্মকাণ্ডে ভর করেছিলেন তিনি— লোকমুখে এরা 'গড়পারের

গুণ্ডা' নামেই খ্যাত ছিল। কিন্তু এদের অপবাদ সম্পর্কে সাফাই গাইতে গিয়ে গড়পারনিবাসী রাখালচন্দ্র দে মশাই কলকাতার 'পরিবর্তন' (৫ই ফেব্রুয়ারি '৮৬)-এর গৌরী দে-র কাছে সাক্ষাৎকারে পরোক্ষে সায় দিয়ে জানাচ্ছেন, "ঠিক বলেছেন, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমাদের সাত-আটজন ছেলে, দরকারে দুশো-তিনশো লোকের মহড়া নিত।" আরেক নিবাসী গোপীনাথ বাবুর কাছে জানা যায়— "মেয়েরাও কিছু কম ছিলেন না। সেই আব্রুর যুগেও ১৯৪৬ সালে তারা ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পাড়ার বাসিন্দাদের কাছে নিজের পাড়াটা যে কতটা আপনার ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র মিত্র। পাড়ার মঙ্গলের জন্যে একটি বিশেষ কারণে তিনি নিজের হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন।"

বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন বিষ্টু কাকুও— কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বাসনা। সেকথায় পরে আসছি এবং ঐ যে গড়পারের গুণ্ডা, আমাদের জীবনে যারা শনিগ্রহের মতো উদয় হয়েছিল, তাদের কথাও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করব।

কেন্দ্রে স্বাধীনতাপূর্ব অন্তর্বর্তীকালীন "সরকারে সমান ক্ষমতা পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেবার পর আকস্মিকভাবে তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, হতাশা ও তিক্ততা" এবং পাকিস্তানের পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে দশ বছরের জন্য সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবটি এবং সেই সঙ্গে অখণ্ড ভারতের শেষ আশাটুকু নেহরুর কপট আচরণের জন্যে ভেঙে যাওয়ায় জিন্নাহ্ তথা মুসলিম লীগ আহূত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের (আমার ১৯৪৬ সনের ব্যক্তিগত কড়চায় দেখছি লেখা রয়েছে 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা' দিবস [Direct Action Day]) ঢেউ আমাদের গড়পারের খেলার মাঠে তেমন আলোড়ন না তুললেও, আমাদের মিত্র স্কুলে, মুকুল ফৌজের শিবিরে, ট্র্যামে-বাসে— কোথায় নয়, আসন্ন ১৬ই আগস্টে কি ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে চলছিল ব্যাপক সাম্প্রদায়িক কল্পকথা।

কিন্তু আমার বালক মনে মহা ধন্দ : লড়াইটা ব্রিটিশের সঙ্গে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতার ব্যাপারটা আসে কোত্থেকে? কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজদের গোপন আঁতাতের প্রেক্ষিতে ঘোর হতাশায় নিমজ্জিত মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে এটাই তো সত্য। শুধু আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় নি লীগ, সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে "ইংরেজ শাসকের আচরণের প্রতিবাদে এবং তার প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে এই [মুসলিম লীগ] কাউন্সিল মুসলমানদের অবিলম্বে বিদেশি সরকার প্রদত্ত উপাধিসমূহ বর্জন করার আহ্বান" জানায়। ফলে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'খান বাহাদুর', 'খান সাহেব' ইত্যাদি উপাধি (কিছু বশংবদ খয়ের খাঁ ছাড়া) বর্জিত হয় (তবে ভারত বিভক্তির পর অনেককেই নিজেদের অতীত 'গৌরব' জাহির করার জন্যে পরিত্যক্ত উপাধিগুলো নামের পেছনে পুনরায় জুড়ে দিতে দেখেছি)। এ উপাধি বর্জন প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি নে। উপাধিহীন অগ্রজ ও আমি উল্লিখিত আহ্বানে এতটাই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে ইংরেজরা কেন আমাদের কোনো উপাধি দেয় নি এ-কারণে তাদের চৌদ্দ গুষ্টির মুণ্ডপাত করে অগত্যা নিজেদের পারিবারিক উপাধি বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অগ্রজ

মঈদ-উর-রহমান সিদ্ধান্ত নিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি— ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে খন্দকারহীন নাম দেখে বাবার বকুনীও কম হজম করতে হয় নি তাঁকে। আমার বেলায় সার্টিফিকেটে নিঃসঙ্গ অবস্থান ছাড়া সর্বত্র বিয়োজন।

যা বলছিলাম। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে মুকুল ফৌজের ক্ষুদে সেনারাও কুচকাওয়াজে মত্ত— গড়ের মাঠে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার কারণে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে কলকাতার তাবৎ ফৌজিয়ানরা সমবেত হবে, সংহতি প্রকাশ করবে, তাই এই প্রস্তুতি। এ তো সেই মুকুল ফৌজ, যা মোহাম্মদ মোদাব্বের তথা বাগবান পরিচালিত দৈনিক আজাদ পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল'-এর অঙ্গসংগঠন, যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন কামরুল হাসান। এই ফৌজের আমিও ছিলাম একজন সক্রিয় সদস্য। বিকেলে গড়পার থেকে মির্জাপুরের টিনঘেরা মাঠে চলে আসতুম--এখানে নিয়মিত আমাদের প্যারেড হতো ব্যান্ড বাজিয়ে। গুরুসদয় দত্তের আদর্শে উজ্জীবিত ব্রতচারী কামরুল ভাইয়ের নির্দেশে আমরা তখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে শপথ নিতুম ব্যান্ডের তালে তালে। কিন্ত কখনও সাম্প্রদায়িকতার স্থূল আলাপ নয়। যদিও সাম্প্রদায়িক কারণেই কামরুল ভাইয়ের মুকুল ফৌজে আগমন। অবাক হচ্ছেন মানি। কিন্ত তাঁর এই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না, নিজ সম্প্রদায়কে ভালোসেবে তার নির্দোষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে দোষাবহ কিছু নেই। যিনি নিজ সম্প্রদায়কে ভালোবাসতে জানেন না তিনি অপর সম্প্রদায়কে ভালোবাসবেন কোন জোরে? তাই অষ্টাঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও, ঐ নিরপেক্ষতার খুঁটিটাকে শক্ত করার লক্ষ্যে যখন বাগবান ভাইয়ের ডাক এলো মুকুল ফৌজকে দাঁড় করাবার জন্য তখন সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা-র আনন্দমেলা-র অঙ্গ সংগঠন মণিমেলা থেকে, তবে মণিমেলা ত্যাগ করে নয়। মণিমেলার অধিনায়ক তখন অগ্রজ আবুল হাসনাত। ভাইয়ের অনুমতি নিয়েই মুকুল ফৌজে যাওয়া। মণিমেলার ছোট্টমণিদের কাছে হাসনাত যদি বড়দা তো কামরুল ভাই মেজদা। এই মেজদা ছিলেন তখন ছোট্ট মণিদের চোখের মণি। তাই যখন মণিমেলার পরিচালক বিমলচন্দ্র ঘোষ তথা মৌমাছি কামরুল ভাইকে পাকিস্তান সমর্থক হিসেবে বরখাস্ত করলেন, সায় দিলে না মণি ভাইবোনেরা, তাদের অভিভাবকেরাও। ওদের, ঐ একগুচ্ছ অমুসলমান কচি প্রাণের হৃদয় থেকে বরখাস্ত হলেন না কামরুল ভাই। ওদের সকলের স্নেহের টানে ১৬ই আগস্ট পরবর্তী ভয়ঙ্কর দিনগুলোতেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে ফিরে গেছেন হিন্দু পাড়ায় লুকিয়ে ছাপিয়ে অনুশীলনে সাহায্য করতে। লেকপল্লীর মণিমেলার ছেলেমেয়েরা চিঠি লিখে জানালে, "মৌমাছির সাথে আমাদের সম্পর্ক পত্রিকার মারফৎ, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে। আপনি আমাদের মেজদাই থাকবেন।" তাইতো দেখি আমৃত্যু তাদের মধ্যে চলে ভালোবাসার চালাচালি। পুণ্যব্রত চৌধুরী আসেন সুইডেন থেকে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে কাগজের মণ্ড তৈরির উপদেশ দিতে। আসেন পশ্চিম বঙ্গের প্রতিমন্ত্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য, এমনি আরো কতো মণিমেলার বুড়ো সদস্যরা আসেন— এসেই তাদের মেজদা তথা গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং তৎসহ গুরু-প্রণামী হিসেবে শিল্পসামগ্রী

নয়তো অন্য কোনো উপহার। কামরুল ভাইয়ের চোখে জল, পুণ্যব্রতদের আনন্দাশ্রু।

কাজেই, কামরুল ভাইকে ভাগাভাগি করে নয়— সর্বক্ষণের জন্যে পেলাম আমরা সর্বাধিনায়ক হিসেবে। আসন্ন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সম্পর্কে আমাদের বোঝানো হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব হিসেবে ১৬ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানই এ দিবসের মূল লক্ষ্য। কিন্তু স্কুলের সতীর্থদের মুখে অন্য কথা শুনি। যখন সুনীতি-শশাঙ্ক-গগনেরা প্রশ্ন করে :

— এসব কি শুনছিরে মীজানুর?

— কি শুনচিস?

— তোরা নাকি আমাদের নেংচে দিবি?

— তার মানে?

— ও বাবা, উদো নাকি! ভাজা মাছটা যেন উল্টে খেতে জানিস নে। ডাইরেক্ট অ্যাকসানের কথা বলচি।

— রক্তগঙ্গা নাকি বইয়ে দিবি?

আমি আঁতকে উঠি, বলি,

— সেকি রে! এ তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক!

— দোয়ারকিপনা রাখ তো, ভাবিস কিছু বুঝিনে, না? আমরা সব জানি।

সত্যি বলতে কি ওদের কথাবার্তায় আমি ভারি কষ্ট পেয়েছিলাম। এই তো সেদিনও চাঁদা তুলে ফুটবল কিনে হেয়ার স্কুল-প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে কতো না আনন্দ লুটেছি। আর আজ হঠাৎ করেই 'তোরা' হয়ে গেলাম! এ দুঃখ রাখি কোথায়? আমার মধ্যে ছিল দুটো আমি। একটা আমি সে ভারি ঘরোয়া— সেই সুন্দরীভবনের আমিই আমার সম্রাট, কারো কথা সে শোনে না, মানে না। তার নিজের মতো করে সে ভাবে, কাজ করে— সেখানে সতীর্থ সুনীতি, গগন, শশাঙ্ক, অজিত, আবদুল, লেনিনেরা অচ্ছেদ্য রাখী-বন্ধনে বাঁধা, আরেকটা যে-আমি তার বাস বাহির-মহলে— বন্ধনহীন, কানকথা শোনে, অল্প বুঝে একেবারে না-বুঝেও। ওখানে তার কোনো হাত নেই। পাকিস্তান ও ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ব্যাপারটা সেদিন তখনকার পরিস্থিতিতে ঐ বালক যেমন করে বুঝেছিল, যেমন করে নিজেরা বুঝেছিলেন এবং আমাদের বুঝিয়েছিলেন কামরুল ভাই এবং এক কালের খদ্দর-পরা (আমাদের পর্যন্ত খদ্দরের প্যান্ট-সার্ট পরিয়ে ছেড়েছিলেন!) ঘোর স্বদেশী পাবক পিতা (আমাদের দেশের বাড়িতে কয়েক বছর আগেও দেখেছি অসহযোগ আন্দোলন কালের নীরব সাক্ষী দাদির প্রিয় চরকাটিকে)।

"…. আপোষ রফা ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার মুসলিম ভারতের যাবতীয় প্রায়স ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে ভারতবর্ষে এক বর্ণহিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।…."

আজ মনে হয়, মুসলিম লীগ কাউন্সিলের উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে ভারত বিভাজনের চিন্তা দৃঢ়মূল হওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। স্বদেশী এবং ব্রতচারী কামরুল ভাই মুসলিম জনসমষ্টির বাইরের কেউ ছিলেন না। ১৬ই আগস্টের ডাকও তাই মিথ্যে ছিল কি করে বলি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আচ্ছা ঐ যে সতীর্থ সুনীতি-গগনের সঙ্গে কলকাতার তাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ১৬ই আগস্টের ভয়াবহতা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস দিচ্ছিল, তার ইঙ্গিত কি একেবারেই ছিল না হাওয়ায়, যা আমার অষ্টম শ্রেণির পড়ো বালক-চোখকে ফাঁকির ফাঁদে ফেলে নি?

ফেলেছে। তখনকার পত্রপত্রিকা, ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্য ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে একটা অশুভ কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তার ইশারা যেন মেলে। তথ্যগুলোর সানী বিচার করে আমার এই ধারণাই হয়েছে, ১৬ই আগস্টে হয়তো তেমন ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটত না, ধর্মঘট ও অনুল্লেখ্য মামুলি দাঙ্গার মধ্যেই হয়তো বা সীমাবদ্ধ থাকত ঐ দিনটি, মোটা কালো দাগে চিহ্নিত হতো না ইতিহাসের পাতায়, বিশ্ববাসীর কাছে হেয় হতো না কলকাতাবাসী, যদি না বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, নেহেরুর গোঁয়ার্তুমি ও কিছু ব্যক্তি বিশেষের লাগামহীন মন্তব্য নগরবাসীর কানকে উস্কে দিত। আরেকটা কথা, ষোলোইয়ের পুরো দিনটার কথা যদি ধরি তাহলে দেখব, সকালে মিষ্টির দোকান লুট অথবা গোয়ালার দুধের পাত্র ফেলে দেয়ার মতো অতি সাধারণ ঘটনা থেকে কোনো মতেই বড় রকমের দাঙ্গার কথা চিন্তাই করা যায়না। আসলে ঐ যে ২৯শে জুলাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক থেকে '১৬ই আগস্ট একটা ভয়ঙ্কর কিছু হবে'র মহা ধুয়ো, তা যেন ঐ মামুলি ঘটনার মধ্যে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। উড়াল দিয়েছিল এক পল্লী থেকে আরেক পল্লীতে— খুনে গুণ্ডাদের হাতে পড়ে যা গড়িয়েছিল পাশবিক তাণ্ডবে।

এবার আসুন কিছু তথ্য দিয়ে পূর্বাভাসের মূল্যায়ন করি। নিচে উদ্ধৃত অধিকাংশ তথ্য সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা' নিবন্ধ (উৎস মানুষ/জানুয়ারি '৯১) থেকে যথেচ্ছ নেয়া হয়েছে। আমার কাজটি সহজ করে দেয়ার জন্যে সন্দীপ বাবুকে ধন্যবাদ।

১৬ই আগস্টের ঘটনা কি করে ঘটতে পারল, যেখানে মাত্রই ১৮ দিন আগে কলকাতা ও শহরতলীতে রচিত হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক মিলনের এক নয়া ইতিহাস। ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘট ও হরতালের ডাকে কলকাতায় তখন অভূতপূর্ব জন-আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ এই হরতালে যোগ দিয়েছিল। *অমৃতবাজার পত্রিকা* ৩১ জুলাই, '৪৬ তারিখে মহামিলনের মতো এ অবম্ভব কাণ্ডটি লক্ষ করে সংশ্লিষ্ট খবরের শিরোনাম দিয়েছিল : 'জেনারেল স্ট্রাইক বাই অল কমিউনিটিস'।

এই যে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য শৃঙ্খল ভেঙে ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ একাত্ম হয়ে সেদিন

আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল সেটা একটা বিচ্ছিন্ন খণ্ড ঘটনা বই কিছু নয়। কারণ এমন একটা অপূর্ব আশাব্যঞ্জক ঘটনার পরেই কিনা ঘটল, ঘটতে পারল, রক্তঝরা ঐ মহা দাঙ্গা— যাকে আমি আমার ছেলেবেলার কড়চায়[১] উল্লেখ করেছি 'গৃহযুদ্ধ' নামে। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ গৃহযুদ্ধই তো বটে। এই যুদ্ধে আশাহত হলেন বিশেষ করে কমিউনিস্টরা— কারণ সফল ধর্মঘটের পরে সঙ্গত কারণেই মেহনতি জনতার মুখপাত্র হিসেবে তারাই খুশি হয়েছিলেন বেশি। এবং আমার বেশ মনে পড়ে ষোলোই আগস্টের ভোরবেলা মানিকতলা-বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের দাঙ্গা থামানো এবং পরে শান্তি মিছিল বের করার প্রধান উদ্যোক্তাই ছিলেন এই কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে বলেছেন— প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক যে এরকম ভয়াবহ চেহারা নেবে, তা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাসের মতে, '১৬ই আগস্টের আগে বুঝতে পারি নি যে একরম হবে।' আরেক নেতা সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যদিও আগের দিন মুসলিম এলাকায় প্রচার করি, বৈঠক করি; কিন্তু এত বীভৎস দাঙ্গা হবে তা ভাবি নি।" (অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব* পৃ. ১৯১-৯২)

শুধু কুমুদ বাবু কিংবা সমর বাবুই নন, ষোলোইয়ের বীভৎসতার কথা কেউ ভাবতে পারে নি। 'এমন কি দেশ-বিদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার মত মূলত মডারেট এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতাও নিশ্চয়ই তার স্বরূপ দেখে আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।' (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *জিন্না পাকিস্তান : নতুন ভাবনা*, পৃ. ২৩৯) এবং এই মহাদাঙ্গাই যে দেশভাগকে নিশ্চিত করেছে ও ত্বরান্বিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশভাগের দিনক্ষণ ১৯৪৮-এর জুলাই থেকে গুটিয়ে এনে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে '৪৭-এর ১৪ই ভারতের ক্ষেত্রে ১৫ই আগস্ট করা হলো। যা কেউ চান নি। এ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'গান্ধী' গ্রন্থে (পৃ. ৬) লেখেন : 'দেখতে দেখতে কি যে হয়ে গেল দেশটা। [মহাদাঙ্গার] এক বছর বাদে দেশ দুটো। অবিকল এক বছর বাদে। বলতে গেলে একই তারিখে। আমরা যেন নিয়তির হাতের পুতুল। মহামানব মহাত্মা পর্যন্ত। কায়েদে আজম ঝীণাও [জিন্না] তাই। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তেমনি। মনে মনে কেউ পার্টিশন চান নি। কায়েদে আজমও না।' যা কেউ ভাবতে পারেননি তার ইন্ধন যারা জোগাল এবারে সেই কথা।

১১ই আগস্ট বাংলার অন্যতম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন বললেন, 'শতাধিক প্রক্রিয়ায় আমরা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারি— বিশেষত আমাদের উপর যখন অহিংসার বন্ধন নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ কি হবে তা বঙ্গের মুসলিম অধিবাসীরা জানেন এবং তাই তাঁদের এ সম্বন্ধে নেতৃত্ব দিতে যাবার আবশ্যকতা নেই।' অপর লীগ নেতা নিস্তার 'একমাত্র রক্তপাতের মাধ্যমেই পাকিস্তান অর্জিত হতে পারে' বলে মন্তব্য করেন। (*জিন্না/পাকিস্তান : নতুন ভাবনা*, পৃ. ২৩৭) জিন্না কিন্তু নিজের রুচি দ্বারা পরিচালিত হয়ে "আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে মুসলমানদের শান্ত থাকার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন : 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস শান্তিপূর্ণভাবে বিচার-বিবেচনার দিন, 'কোনো আকার বা প্রকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার;' দিন কোনোক্রমেই নয়।" (*জিন্না*

পাকিস্তান পাদটীকা, পৃ. ৪৫) অপরদিকে ১০ই আগস্ট লীগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে নেহেরুর হুমকি, 'লীগ সরকার গঠনের পথে গিঁট পাকাচ্ছে। আমরা গিঁট খোলার চেষ্টা করব; না পারলে কেটে দেব।' (প্রাগুক্ত, ১১ই আগস্ট)

মৌলানা আজাদ নেহেরুর এ জেদের কথা আরো জোরালোভাবে উল্লেখ করেন তাঁর গ্রন্থে। মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষোভ দেখে আজাদ নেহরুকে অনুরোধ করেন, কংগ্রেস এরকম একটা বিবৃতি দিক যে, ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব সম্পর্কে নেহরু যা বলেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত মত। কিন্তু নেহেরু রাজি হন না; কারণ তাহলে তাঁর ইজ্জত চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত নেহেরুর উল্লেখ না করেই কংগ্রেস একটি বিবৃতি দেয়। (আজাদ, *ইন্ডিয়া, উইনস ফ্রিডম*, পৃ. ১৬৭)

ব্যক্তিগত ইজ্জত-এর জন্যে কত সহজেই দাঙ্গা ও দেশ ভাগের মতো ইতিহাস উল্টে যাওয়া ঘটনা ঘটে গেল।

পাল্টা জবাব চালাচালি কেবল নেতারা মুখেই দিচ্ছিলেন না, ভেতরে ভেতরে যেন তার প্রস্তুতিও চলছিল। মৌলানা আজাদ টের পাচ্ছিলেন, কলকাতায় এ-রকম এক ধারণা চালু হয়ে গেছে যে, ১৬ই আগস্ট লীগ কর্মীরা কংগ্রেস কর্মীদের আক্রমণ করবে এবং লুটপাট করবে কংগ্রেসের সম্পত্তি। আজাদ এও লক্ষ করেছিলেন, ১৬ই আগস্ট বাংলা সরকার হরতাল ঘোষণা করায় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮)

ব্রিটিশ সরকার আঁচ করতে পেরে ৮ই আগস্ট ভাইসরয় ওয়াভেল বাংলা-পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরদের নিয়ে বৈঠক করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

প্রথমে হরতাল ডেকে পরে হরতালকে সফল করার জন্যে মুসলিম লীগ সরকার ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে। কিছু উর্দু পত্র-পত্রিকা এ সময় বল প্রয়োগের মনোভাব দেখিয়ে মুসলমান সমাজকে সাম্প্রদায়িক মোহে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা চালায়। আর দাঙ্গাটা যে করবে ঐ উর্দু-অলারাই, বাঙালি মুসলমানেরা নয়, এ সত্য বক্ষ্যমান রচনায় ক্রমশ উন্মোচিত হবে। আগস্ট ছিল রমজান মাস। এ মাসকে উল্লেখ করে কলকাতার মেয়র ও লীগের কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রচারিত এক পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল, 'এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়।.... আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের জন্য নিলিখ ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন।' (*প্রবাসী*, আশ্বিন, ১৩৫৩) এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় আজাদ মসুলমান ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান বলেন, 'ধর্মের দোহাই দিয়া এই দাঙ্গায় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করানো হয়েছে।' (*প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৫৩)

অন্যদিকে হিন্দু পত্রিকার তরফ থেকেও প্রচার চলছিল। 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র, ১৩৫৩) লেখা হয়, 'সাম্রাজ্যবাদ আজ পাট গুটাইতেছে ; সুতরাং লীগ এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অন্যায় অধিকারগুলি কায়েম রাখিবার চেষ্টায়।' জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, লীগের প্রচারের বিরুদ্ধে 'কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু মহাসভাঘেঁষা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়' (গ্লানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)। '*শনিবারের চিঠি*'র

শ্রাবণ (১৩৫৩) সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সংক্রান্ত একটি লেখা নিয়ে অহেতুক মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে। হিন্দুরাও যে তৈরি হচ্ছিল, জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা আবুল মনসুর আহমদের রচনায়ও তার উল্লেখ আছে : নাজিমুদ্দীনের প্ররোচনাময় ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত এগ্রেসিভ হইয়া উঠিল।' (আবুল মনসুর আহমদ/*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ২৫৩)

এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির ডামাডোলের মাঝে দুই সম্প্রদায়ের নেতারা একেবারে চুপ করে ছিলেন বলা যাবে না। মৈত্রী ও শান্তির কথা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। ১২ই আগস্ট লীগ নেতা আবুল হাশিম স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "কোনো অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে মানুষে মানুষে সংঘর্ষের পথে নিয়ে যাওয়া হবে না।" (*অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৬)

১৪ই আগস্ট দেশপ্রিয় পার্কের এক জনসভায় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। 'মুসলমান ভাইদের' কাছে তিনি বিশেষভাবে আবেদন করেন। লীগের ডাকে যারা সাড়া দেবে না, তাদের ব্যাপারে যেন কোনো হস্তক্ষেপ না করা হয়। (*হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ১৫ই আগস্ট)

লীগের পক্ষ থেকে মৌলানা আকরম খান, জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী আশ্বাস দেন যে, ১৬ই আগস্ট কোনো হিংসাত্মক চেহারা নেবে না। জিন্নাহ তাঁর আবেদনে বলেন, "I enjoin on the Musalmans to... ... conduct themselves peacefully and in a disciplined manner and not to play into the hands of our enemies." (*হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ১৬ আগস্ট)

সোহরাওয়ার্দী বিধান সভায় ঘোষণা করেন, লীগ হিংসা বা হুমকির আশ্রয় নেবে না— এটাই পরিকল্পনা। (প্রাগুক্ত)

কিন্তু ভাগীরথীর জল তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস তখন পরিস্থিতিকে এমনই বিষিয়ে দিয়েছে যে, এসব আশ্বাসবাণীতে কোনো কাজ হয় নি। দু'তরফেই আস্ফালন ও দোষারোপ চলতেই থাকে। ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা বিধান সভায় যে প্রস্তাব এনেছিল ৩১-১৩ ভোটে তা নাকচ হয়ে যায়; তবে বিস্তর বাদানুবাদ হয়। কংগ্রেস নেতা বিজয়সিংহ নাহার বলেন, এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিধান সভার ইউরোপীয় সদস্য জি. মরগ্যানের মতে যে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে। (*হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ১৬ আগস্ট)

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হলো, 'উদ্বিগ্ন হবার মতো কারণ যথেষ্টই আছে ; কারণ বিভিন্ন এলাকা থেকে হুমকির খবর পাওয়া যাচ্ছে।' (১৬ আগস্ট)

কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা *স্বাধীনতা* (১৬ আগস্ট)য়ও 'ঘরোয়া লড়াই এবং ব্যাপক দাঙ্গার' আশঙ্কার উল্লেখ করে 'জাগ্রত এবং হুঁশিয়ার' মুসলমান জনগণের কাছে 'মিলিত সংগ্রামের' আবেদন জানানো হয়।

দেশপ্রিয় পার্কের জনসভায় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কিবরণশঙ্কর রায় প্রমুখ কংগ্রেস

নেতারা খোলাখুলিভাবে মুসলিম লীগকে দায়ী করেন। সুরেনবাবু বলেন, লীগ কোনোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নি; আর এখন পৃথক প্রতিনিধিত্বের সুযোগে ক্ষমতায় এসে তারা হাঙ্গামা বাধাতে চাইছে। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার জানতে চান, বাংলা সরকার কি এখন মুসলিম লীগের সাব কমিটি হয়ে কাজ করছে? (*হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ১৬ই আগস্ট)

দোষারোপের পালা এভাবে চলতে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৬ই আগস্ট কি ঘটতে পারে তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় নি— এটা মোটেও ঠিক নয়। মণিকুন্তলা সেন তাঁর *'সেদিনের কথা'* গ্রন্থে লিখেছেন, লীগ ১৬ আগস্ট মিছিল ডেকেছিল— 'এই মিছিলে কিছু একটা ঘটবে এটা সবাই অনুমান করেছিল। হিন্দুরাও পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হলো।' (পৃ. ১৭০)

মণিকুন্তলা-র উল্লিখিত উক্তিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উন্মোচিত হলো, আর সেটা হলো এই যে হিন্দুরা অকস্মাৎ বিনা প্রস্তুতিতে আক্রান্ত হয়েছিল এ ধারণটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ হিন্দুদের উদ্বিগ্ন ও আক্রমণের জন্যে তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি আগেই গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা যথাস্থানে বর্ণনা করব।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পূর্বাভাস যে পাওয়া গিয়েছিল, তা পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে রণেন সেন বলেন, 'আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলুম; কিন্তু তার গভীরতা অনুধাবন করতে পারি নি।' অন্যদিকে খোকা রায়ের কথায়, 'তিন-চারদিন আগেই বোঝা গিয়েছিল— খারাপ কিছু ঘটবে।' (*উত্তাল চল্লিশ*, পৃ. ১৮৯, ১৯৪)

একটা কথা বলতে ভুলেছি। কথাটা কমিউনিস্টদের নিয়ে। কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনটি নিয়ে কিছুটা দোদুল্যমানতা ছিল। বোধকরি যথেষ্ট বলা হলো না, কারণ লীগের ডাকা এই ধর্মঘট সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি আর তার অঙ্গ সংস্থা ট্রেড ইউনিয়ন সেদিন আসলে একটা বিশেষ অবস্থানই নিয়ে ফেলেছিল। মাত্র দুদিন আগে, ১৪ই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের এক সভায় 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে', এবং 'শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য' ১৬ই আগস্ট আহুত ধর্মঘট সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (*অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৬ আগস্ট)। কমিউনিস্টদের পরিচালিত ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আরো কয়েকটি কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়নও ধর্মঘটে যোগ দেয়।

পাঠক, আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন এই ঐতিহাসিক সত্যটি জেনে। হয়তো প্রশ্ন জাগছে মনে, একটা সাম্প্রদায়িক দলের ডাকে কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মঘটে কি করে যোগ দিতে পারল। একটু তলিয়ে দেখলেই জবাব খুঁজে পাবেন। শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ ছিল মুসলমান। এবং পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও এদের লীগের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল— শ্রমিক ঐক্যের লক্ষ্যে এদের ঘাঁটানো তাঁরা অর্থাৎ কমিউনিস্ট নেতারা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছিল কিনা কিংবা তা সত্যিই শ্রমিক-ঐক্যের সহায়ক ছিল কিনা তার উত্তর আজ কে দেবে?

এবার মহাদাঙ্গাকে ঘিরে আমার দেখা বিবরণ।

খুব সকালে ওঠা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই। মায়ের তাড়াতে নয়, বাবার ভর্ৎসনায় বিছানার মায়া কাটাতেই হতো। উঠেই চুলোর কয়লার ধোঁয়ায় চোখের জলে নাকের জলে। সেকালে এই ব্যাপারটা ছিল। ভোর হলো তো বাড়ি বাড়ি ধোঁয়ার উদ্‌গারে কলকাতার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠত।

কিন্তু আজ খুব ভোরেই উঠে পড়েছি— স্কুল ছুটি এবং বাবা বাড়ি নেই এমন যুগল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। আমাদের নতুন ভৃত্য আবদুল সবে কয়লা ভাঙছে। মা নামাজ সেরে কোরান আবৃত্তিতে মগ্ন। পুব দিগন্তে সূর্য উঠেছে— আকাশে তার ইশারা।

একটা উত্তেজনা আগে থেকেই ছিল, তারই জের এই সকালে ওঠা। আর সেটা তো ষোলোকে ঘিরে।

কিন্তু ষোলোইয়ের কোলাহল কোথায়? তবে যে সবাই বললে আজ একটা কিছু হবে। তাহলে কেন দানোর মতো ঘাড়ে চেপে বসা অশান্ত নীরবতা? একটু দেখতে হয়। শোবার বড় ঘরটা পেরিয়ে ওপাশের খোলা বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়েছি, প্রাণটা ধক্ করে উঠল— মড়ার মতো পড়ে আছে রাজপথটা— কেমন যেন অচেনা মনে হলো সব।

এমন সময় পেছন থেকে বড় ভাইয়ের গলা, বেলা এত হয়ে গেল, হকার ব্যাটার পাত্তা নেই। যাতো, মানিকতলা থেকে একটা *স্টেট্‌স্‌ম্যান* নিয়ে আয়।'

বড় ভাইয়েতে আমাতে মিলে গড়ের মাঠে যাবো আগে থেকেই সব ঠিকঠাক। সকালেই মিছিল যাওয়ার কথা। কলকাতার তাবৎ মুসলিম পল্লী থেকে একে একে মিছিল যাবে ঐ গড়ের মাঠে। ওখানে আজ মস্তো মিটিং— প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপরেখা জানাবেন লীগের নেতারা। আমরা যারা ছোট, বড়দের মতো ক'রে সব কিছু চট করে বুঝি না— একটু বুঝতে হয় যে। মুসলিম লীগ বলছে, পাকিস্তানের দাবি তুলে নিয়ে আমরা তো চেয়েছিলাম ভারত অখণ্ডই থাকুক, মেনেও নিয়েছিলাম ক্যাবিনেট মিশনের অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে এ.বি.সি.-র ধ্যান-ধারণা। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে দিলে সব ভণ্ডুল করে ঐ ব্রিটিশ রাজ— কাজেই আমাদের লড়াই এবার সরাসরি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস লীগের এই যুক্তি নাকচ করে দিয়ে বলছে, ওটা বাক্ প্রপঞ্চ বই কিছু নয়— সংগ্রামটা আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানলুম। কিন্তু তাহলে কেন ক্ষেপবে হিন্দু জনগণ? সুনীতি গগনেরা কেন ওদের নেংচানোর অভিযোগ তুলবে? তাহলে জিন্নাহ যখন বলেন কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা কথার ধাঁধা বই কিছু নয়, আসলে ওটা হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল— তাহলে সেটা তো মিথ্যে কিছু বলেন না। নাঃ, এসব জটের একটা হিল্লে হতেই হয়।

— কিরে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়, যা না— খবরের কাগজে আজকের ডাইরেক্ট অ্যাকশন নিয়ে কি লিখলে একবার জানতে হবে না? জানিস, সরখেলটা পর্যন্ত উল্টো কথা বললে সেদিন।' বাদুরবাগানের সরখেল বড় ভাইয়ের সতীর্থ ও কাছের বন্ধু। আমার যেমন সতীর্থ সুনীতিকে নিয়ে নালিশ,বড় ভাইয়েরও তেমনি সরখেলকে ঘিরে।

— কিন্তু মিছিল?

— এখনো ঢের দেরি। সবে তো সাড়ে ছটা। কাগজটা আগে পড়তে হবে না?

তবে হরতালটা বেশ জমেছে। দেখতে পাচ্ছিস না, চারদিকটা কেমন চুপচাপ? এখন যা তো। আর একটা কাজ করিস, ঐসঙ্গে দুধের বাকেটটাও নিয়ে যাস— ফেরার পথে মনে করে নিয়ে আসিস।

আমি শার্টটা গায়ে চাপিয়ে বাকেট হাতে সিঁড়ি ভাঙি। আমাদের বাসা থেকে দুতিনটে বাড়ি পরেই বড় রাস্তা, অর্থাৎ আপার সার্কুলার রোড। গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম কিছুই চলছে না— পুরো হরতাল। ইঁট ও রঙের দোকানটা দেখছি খোলা, দাদুর কেবিন হাফ-খোলা। মানিকতলার নতুন বাজার খোলা হলেও খোলা নয়— কেউ পা মাড়ায় না যে। কলকাতার আর কটা বাজারের মতো হা-ভাতে নয়, এ সেকালের নিরিখে রীতিমতো আধুনিক। তবুও না। গড়পার-সুকিয়া স্ট্রিট ও আশেপাশের পড়শীদের সুবিধের জন্যে, কেউ বা বলেন বাজারের মালিক আখের গোছাবার জন্যে মানিকতলা বাজারের সঙ্গে আড়াআড়ি করে এই বাজার চালু করেছিলেন। কিন্তু পুরানো বাজারের কাছে হেরে গেছে নতুন বাজার। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে কেউ ওমুখো হতো না। পরিচ্ছন্ন এই বাজারকে পাশ কাটিয়ে সবাই ছুটত ঐ স্যাঁতসেঁতে হতশ্রী মানিকতলা বাজারে। আমরাও।

গোয়ালার আড়তে যেতে আড়তদার বললে, দুধ আসেনিকো খোকাবাবু। রেখে যাও— যদি আসে তো যাবার কালে নিয়ে যেও। শুনচি ওদিকে বড় ঝামেলা....

কৌতূহলটা চাগিয়ে ওঠে। বাকেটটা রেখে এগোই। ট্রামের শি শি ডাক নেই, গাড়ির ভেঁপু নেই, ঘোড়ার টগবগ কি রিকশার টুংটাং নেই, নেই পাদচতুর পথিক— বুক টান করে পড়ে আছে সুনসান রাস্তাটা। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজার সামনে মুখ তোলো করা উৎসুক লোকের জটলা, জানালায় ছাতে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ানো পুরনারী— কিন্তু যেন জ্যান্ত নয়! মানিকতলার মোড়ের দিকে তাকিয়েছি, দেখি চৌমাথার মাঝ বরাবর কিছু মিলিটারি, পুলিশ ও সিটি পুলিশ দাঁড়িয়ে। ঠিক মাথায় ঢুকল না, এতগুলো পুলিশ এই সাতসকালে! কি এমন ঘটল। মোড়ে এসে গেছি ততক্ষণে। এক দৃশ্য বটে! বিবেকানন্দ রোডের দিকে শ'দেড়েক উত্তেজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নেচেকুঁদে খুব পাঁচাপাঁচি করছে। মাঝে মাঝে ঢিল ছুঁড়ছে আর ছন্দ বজায় রেখে 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি তুলছে। না, রাস্তার মাঝখানে ঠায় দাঁড়ানো মিলিটারি কি সিটি পুলিশদের লক্ষ করে নয়, উদ্দিষ্ট রাস্তার ওপারের মানিকতলা যেন রোডের বস্তিবাসী মেঠো উর্দুভাষী কলকাতিয়া ও পশ্চিমা মুসলমান সম্প্রদায়। জবাবে এরাও লম্ফঝম্ফের সঙ্গে গলাবাজি কম করছিল না : 'লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও 'আল্লাহু আকবর' হাঁক থেকে থেকে খুব চলছিল আর ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় এই আপ্তবাক্যের যথার্থতা প্রমাণে ভারি তৎপর ছিল, অর্থাৎ ইঁটনোর কাজটি দক্ষতার সঙ্গেই পালন করছিল।

কিন্তু যে-কাজে এসেছি তার কি হবে? কাগজওয়ালা কোথায়— বাজারের সামনে যে হকার বসত সেখানটা ফাঁকা। রাস্তার ধারের বাজারের দোকানপাটও সব বন্ধ। জিজ্ঞেস করে যা জানা গেল তাতে বুঝতে পারলাম দুধের আড়তে দুধের চালান যায় নি কেন, আর সেই সঙ্গে ইঁটনোর রহস্যটাও ফর্সা হলো।

মেন রোড ধরে পুবে গেলে খালের ধারে যে সাঁকো (মানিকতলা ব্রিজ) পড়ে,

ঘটনার গোড়া সেখানে। এক গোয়ালার সঙ্গে মুসলমান পিকেটারদের কথা কাটাকাটি হয়— প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস শুধু সরকারি ছুটি নয়, এদিন হরতালও ডাকা হয়েছে কাজেই দুধ কেনাবেচা বন্ধ। গোয়ালা শুনবে কেন সে-কথা, তার যুক্তি— চালানের দুধটা যে মারা যাবে তার, খালের জলে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তাহলে উপোস দিতে হবে যে তাকে। কিন্তু তেরিয়ান পিকেটারদের এক গোঁ। এভাবে উভয়পক্ষের সেরকশপনা খুব চলে। এক পর্যায়ে গোয়ালা গোবেড়েন মার খায় এবং তার দুধের ভাণ্ড ফেলে দেওয়া হয়— দুধ গড়িয়ে রাজপথ একাকার। এই ছোট ঘটনাটি আর ছোট থাকে না, হিন্দুদের মনে মোটা দাগ কেটে যায়, তারা ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এটাই বোধকরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান! গোয়ালা শ্রেণিদ্বন্দ্বে যত ছোট ও অচ্ছুৎই বিবেচিত হোক না, তার গায়ে হাত তোলা মানে সমগ্র হিন্দু জাতির গায়ে হাত তোলা। পিলুড়িপনা আর কাকে বলে! দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল— একদিকে জয়হিন্দের জয়ধ্বনি অপর দিকে লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান-এর তুর্যনাদ।[২]

আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা এই।

পুলিশের মানব-শেকলের এপারে-ওপারে ইঁটপাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি তখনো চলছিল। পুলিশ দাঁড়িয়ে সব দেখছে, কাউকে বাধা দিচ্ছে না। ব্যাপারটা আমায় ভাবাল। এমন সময় প্রাণ সেঁধনো হৈ চৈ শুনে চমক ভাঙে। অদূরে আপার সার্কুলার রোড ধরে গড়ের মাঠগামী একটা মিছিল এগিয়ে আসছিল। সেই মিছিল তাক করে ছাত থেকে সাধারণ ঢিল নয়, রীতিমতো থান-ইঁটের বৃষ্টি ঝরছিল। এই অতর্কিত আক্রমণে নিরীহ মিছিলকারীদের অনেকেই জখম হচ্ছিল।[৩]

এই আকস্মিক ঘটনায় মানিকতলায় যুদ্ধমান মুসলমানদের দলটি হকচকিয়ে যায়। সম্বিত ফিরে পেয়ে পরক্ষণেই মিছিলের সাহায্যে এগিয়ে যায় 'ইয়া আলী! ইয়া আলী!' ধ্বনি তুলে। আমি একা দাঁড়িয়ে। বিপদ বুঝে আমিও ছুটে যাই। এবার উভয়পক্ষে মুষলধারে ইটপাটকেল বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আলী তাদের শক্তি জোগাতে ব্যর্থ হলেন, কারণ হিন্দুরা ছাতের নিরাপদ এলাকা থেকে ইঁটের টুকরো ছুঁড়ছিল। মিছিলের অনেকেই রক্তাক্ত দেহে অসহায়ভাবে ছোটাছুটি করছিল। এই ভয়ানক পরিস্থিতি আমার বালক মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঐ চরম উত্তেজনার মুহূর্তে আমার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকি। কিন্তু বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয় নি— কারণ ঘটনার বীভৎসতার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পারলেও আমাকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় দেখে ক্ষুব্ধ একজন কলকাতিয়া চেঁচিয়ে বলে উঠল, আবে খাড়ে হোঁকে কিয়া তামাশা দেখতে হো— ইটা ফেকো।'

— ঠিক কহাঁ বে ইয়াসিন। দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে মজাক লুটচো কেন— হাত চালাও।' আমাকে ধমকে দ্বিতীয় কলকাতিয়া লোকটি ঢিল ছোঁড়ায় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[৪]

কাগজের জন্যে এসে এত ভালো গ্যাঁড়াকলে পড়া গেল। হঠাৎ আমার ভারি রাগ হলো— সম্পূর্ণ ব্যাপারটার ওপর মহা রাগ। হাতে উঠে এলো ঢিল। ফণিকাকা, অক্ষয় কাকা, বাসন্তীদি, কমলবাবু স্যার, নারায়ণবাবু স্যার— এঁরা কেউ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন না, শাসন করলেন না এই বলে, এসব কি হচ্ছেরে মীজানুর!'

আমার অবোধ কম্পিত উদ্যত হাত পরক্ষণেই সংবিত ফিরে পায় যখন হঠাৎ সামনে যমদূতের এত ব্যাটন হাতে পুলিশ এসে দাঁড়ায়। ম্যাজিকের মতো কাজ হলো— ইঁটোইঁটি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করলে না। আমার ভারি অসোয়াস্তি। আমি মূল দল থেকে বেরিয়ে বাজারের ফুটপাথে এসে দাঁড়াই। সামনেই দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ওটা তখন লুট হচ্ছিল[৫]— লুট করছিল মুসলমানেরা। আশেপাশের অন্য কোনো দোকান নয়— বৈষয়িক বৈভবে নয়, রসনারোচনে মুক্তি! অর্থাৎ মারি তো হাতি গণ্ডার/লুটি তো মিষ্টান্ন ভাণ্ডার! মুসলমানদের এই ব্যাপারটা আছে। যার যেটা পছন্দ, যেমন পাও তেমন খাও! মোচ্ছব আর কাকে বলে! রসবিলাসে মত্ত সবাই। কেউ খাচ্ছে হয়তো রাবড়ি— পাশেই সন্দেশের কাঁসার থালা— আক্রান্ত হচ্ছে ঐ সন্দেশ! দু'হাতে চলছে— গালে রস, হাতে রস, লুঙ্গিতে রস— রসে রসময়। কতো আর খাবে— ডাবরিতে গামলাতে ভাণ্ডিতে, আরো কতো! কাজেই ঢালো লুঙ্গির কোঁচড়ে : জিলিপি, রসমালাই, পানতুয়া, রসগোল্লা, রসকদম্ব— মায় দইয়ের এক মহা সহাবস্থান! লুঙ্গির কোঁচড় মুঠোয় ধরে এক লুটেরা রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মিষ্টির ককটেলে গড়াগড়ি— তাই দেখে হাসির হররা যেমন চলে, মিষ্টির লোফালুফিও চলে মন্দ নয়। চোহেলের রৈ রৈ— ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও।[৬]

আমি এসব দেখছি, মজাও পাচ্ছি। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পাকিস্তান দাবির সঙ্গে এর সংযোগ কিছুতে যদি মেলাতে পারি— কিন্তু অবাক হচ্ছি নে মোটে, কারণ, গুণ্ডার কাজ গুণ্ডা করছে, এতে বিস্ময় মানার কি আছে। বরং এ বেলা খবরের কাগজটা পেলে বাড়ি যাই। গড়ের মাঠে যেতে হবে— এ তো আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। মুকুল ফৌজের সদস্যরাও যাবে। কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে কাগজের আশায় গুড়ে বালি। পা বাড়িয়েছি বাড়ি যাবো, কানে এলো আক্রান্ত মিছিল থেকে নেতাগোছের একজন কেউ পুলিশের সার্জেন্টের কাছে অভিযোগ করছে— দেখিয়ে ইয়ে হিন্দু লোগ হামালোগোকা উপর কেতনা জুলুম কর রাহা হ্যাঁয়। এইসা করনেসে বহুত খাতারনাক হো জায়গা হম বোল দে রাহা হ্যাঁয়।

বেশ কাটাকাটা চাঁছাছোলা কথা। পুলিশের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় এটা আমার জানা ছিল না। পুলিশ-পুঙ্গব মিনমিনে গলায় এমনভাবে জবাব দিলে যেন সে ওর বড় কর্তার সঙ্গে কথা কইছে— হাঁ হাঁ, বাত তো সহি হ্যাঁয়। সব ঠিক কর দে রাহা হুঁ।'[৭]

— তব জলদি কিজিয়ে।'

— কই বাত নাহি। ফিকির মাত কিজিয়ে।'

আলাপ শেষ হয়েছে কি হয় নি বিবেকানন্দ রোড থেকে 'নেতাজী জিন্দাবাদ' 'জয়হিন্দ'-এর জোর ঘটারোল![৮] কি ঘটনা, কেন ঐ রোল? ছোট! মুখে বোল 'আল্লাহু আকবর'!

লুঠ হচ্ছে পাল্টা মুসলমানদের দোকান। উত্তেজিত মুসলমানেরা এগিয়ে বাধা দিতে চাইল, কিন্তু পুলিশের মানব-শেকল বাধ সাধল। বাধা দিল মিছিলের মুসলিম নেতারাও। শান্তিরক্ষার দায় পুলিশদের। তারাই একটা কিছু করুক। পুলিশের একটি দল ওদিক পানে ছুটল।

এদিকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট থেকেও 'জয়হিন্দ'-এর শ্লোগান শোনা গেল এবং একই

সঙ্গে বাজখাঁই কণ্ঠস্বর : কোথায় শালা নেড়ের বাচ্চা— এদিকে আয়, কেমন বাপ্পাই ডাক ডাকিয়ে ছাড়ি দেখবি আয়।' মানিকতলা যেন রোডের ভাঙা দলটা ছুটল সেদিকে। আমার হয়েছে যত ঝামেলা— অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে দলছুট থাকা সম্ভব হচ্ছে না, বিপদ ঘাড়ে এসে চাপবে— যদিও আমার হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্টের গায়ে লেখা নেই হিন্দু কি মুসলমান। আসলে আমি তো জানি— ভয়টা সেখানে। যাই ওদের পিছু পিছু। এ-যেন শাট্‌ল ককের খেলা। দীনেন্দ্র স্ট্রিটের গলির মোড়ে যাওয়া মাত্র ছাত থেকে অজস্র উড়ন্ত ইঁট-পাটকেল সোডা ওয়াটারের ভাঙা বোতল ইত্যাদির মুখোমুখি! আমার বালক-মনে খটকা : কংগ্রেস যে বলাবলি করত সংগ্রামটা তাদের বিরুদ্ধে— বাস্তবে দেখছি তা করিয়ে ছাড়বে। ছাতে এতসব ইঁট-পাটকেল আসল কোত্থেকে! উড়ে তো আর জুড়ে বসে নি। এভাবে গায়ে পড়ে ঝগড়ার মানে? বেশ রাগ হলো।

কিন্তু আমার বালক-মনে আরো খটকা : দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের মধ্যে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের ও বর্ণের লোকদেরই দেখতে পাচ্ছি— আহীর, মুদ্দোফরাস থেকে শুরু করে উঁচু বর্ণের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বাঙালি-অবাঙালি সবাইকে এমন কি মহিলা (এদের দেখেছি ছাতে ঢিল ছুঁড়তে কিংবা সহায়ক ভূমিকায়)-রাও বাদ নেই।[৯] ধর্মতলার এক চারতলা ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে মিছিলের ওপর জনৈক মহিলার গরম জল ফেলার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সে কথায় পরে আসব। কিন্তু আশ্চর্য, মিছিলে কি দাঙ্গাহাঙ্গামায় রত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে কোনো ভদ্রলোক চোখে পড়ে নি, কোনো বাঙালিও নয়— সবাই নিচু শ্রেণির কলকাতিয়া কুট্টি ও খোট্টা সম্প্রদায়ের লোক![১০]

ওদিকে ঘটনাস্রোত বয়ে চলেছে।

শোঁ শোঁ শব্দে অবিরাম ইঁট-পাটকেল উড়ে এসে রাজপথে পড়ছিল— কারো কারো গায়েও। ছাত থেকে এমন আক্রমণের প্রত্যাশা কেউ করে নি। সবাই হতবাক। অপ্রস্তুত। ইতোমধ্যে কারো কারো হাতে লাঠিও শোভা পাচ্ছে— কিন্তু এই অস্ত্রটিও ঐ আক্রমণের কাছে বেকার। ছাতের আক্রমণ অসম্ভব বিবেচনা করে মাছের তেলে মাছ ভাজার ব্যবস্থা হলো। অর্থাৎ লড়ুয়ে যুদ্ধরঙ্গ মুসলিম দলটি হিন্দুদের পরিত্যক্ত ইঁট-পাটকেল সোডার বোতলের টুকরো দিয়েই দাঙ্গার জবাব দিলে।

— আবে সালা মালাউন কা বাচ্চা, হিম্মত থাকে তো সামনা এসে লড়াই করো— লুকিয়ে ছাপিয়ে ক্যানো?

পাল্টা জবাব :

— লে বাব্বা! লোচ্চা নেড়ের কথা শোনো। খেজুরের দেশ থেকে এয়েচিস— ভাগনা সেখানে।

ইঁটযুদ্ধ তর্কযুদ্ধ পাশাপাশি।

কতক্ষণ ইঁটনো চলছিল জানিনে, হঠাৎ আমার ডান পায়ে যেন পর্বত ভেঙে পড়ল। আমি চিৎকতার করে ধূলিধূসর রাজপথে পড়বার মুহূর্তে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি হৃষ্টপুষ্ট লাঠি হাতে এক আহীর ব্যাটা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ভেতর দৌড়ে পালাচ্ছে।

উঠতে যাব, পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। মাংস ফুলে রক্ত জমে কালচে দাগ হয়ে আছে উরুদেশে। ভারি যন্ত্রণা। নড়াচড়া নাস্তি। কিন্তু যখন দেখলাম আশেপাশে কেউ নেই,

একেবারে ফাঁকা, প্রাণপাখি যায় উড়ে। মানুষের ভয়ে ঐ ভাঙা পা নিয়েই অবিশ্বাস্য গতিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যাই ঐ মানুষেরই কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবি, একবার শুধাই : নেংচালো কেরে গগন, তোরা না আমরা?' মনে মনে হাসি, হাসির সঙ্গে যোগ হয় রাগ। নাঃ, এবার বাড়ি যেতে হয়। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর বাড়ি ফেরা যায় না— মজা কি, হিন্দু পল্লী ভেঙে হিন্দু পল্লীর কোলেই ফিরতে হবে আমাকে, কি ক'রে সম্ভব সেটা। এবং এত যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপরও কি করে ভাবছি একবার বাড়ি যেতে পারলে সব দিক রক্ষে। একটু ভাবছি নে— কোথায় আমি যেতে চাইছি, বা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মা-ভাই-বোনেরা শিবাজীভক্ত বা গড়পাড়ের গুণ্ডাদের হাত এড়িয়ে আস্ত আছে তো? আমার বালক-মনে বাড়ি মানে বাড়ি, যেখানে সুখ সহায় আর সোয়াস্তি।

কাজেই আপার সার্কুলার রোডের দিকে এক পা দু'পা করে এগোই। প্রতিটি পদক্ষেপে যন্ত্রণা। তাও ভালো যে যন্ত্রণাটুকু ভোগ করছি— ঐ ডাঁশা লগুড়টি মাথায় পড়লে তো তাও জুটত না। কিন্তু চৌমাথায় এসে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন যায় গুঁড়িয়ে। এ যেন রিওয়াইন্ড করা দৃশ্য : ঢিল ছোঁড়া চলছে তবে এবার এখানে ছাতগুলো যোগ দিয়েছে আর লেঠেলদের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে কয়েক গুণ।

দূরে একটা কোলাহল। একটা প্রাইভেট কার বাগবাজারের দিক থেকে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে— গাড়িটাকে ঘিরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' 'আল্লাহু আকবর'-এর সমবেত ধ্বনি। বিবেকানন্দ রোড়ের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে গাড়িটা দাঁড়াল এবং ভেতর থেকে একজন লীগের পাতি নেতা বেরিয়ে এসে দরজায় ঠেস দিয়ে জনতার উদ্দেশে বললেন : এটা খুবই লজ্জার কথা আপনারা মারামারি করছেন। খুবই শরমিন্দার কথা...'

— আপনার এ কথা ঠিক নয়। ইয়ে আপকা গলদফামি হ্যায়। আমরা আগ বেড়ে মাঠে নাবি নি— উস লোগই তো ঝগড়াটা বাধাল। আমাদের সাচ্চা বাত।' কথা শেষ করতে না দিয়েই সমবেত কণ্ঠ গর্জে ওঠে— আল্লাহু আকবর!

— ঠিক আছে, আমি আমার কথা ফিরিয়ে লিচ্ছি। কিন্তু ভাইয়ো, আজ সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিপন্ন। মুসলিম দুনিয়ার বিশেষ করে হিন্দুস্তানের মুসলমানেরা আজাদীর জন্যে মোনাজাতের দিন আজ। আপনারা জুম্মার নামায আদায় করে আল্লাহর দরগায় হাত তুলে পানা চান। তারপর কোনোরকম গোলমাল না করে গড়ের মাঠে চলে যান। সেখানে সোহরাওয়ার্দী সাহেব, নাজিমুদ্দিন সাহেব, শাহ আজিজুর রহমান সাহেব এবং অন্যান্য নেতারা বক্তৃতা দেবেন। শুনে, সেই মতো কাজ করুন।'

লীগ নেতার বক্তব্য শেষ হলে ভিড় থেকে দু'একজন মন্তব্য করল : কিন্তু আমরা যদি ময়দানে চলে যাই, তাহলে খালি মহল্লা দেখবে কে? সুবেসাদেক থেকে যা ঝামেলা শুরু হয়েছে— হিন্দুরা লুঠতরাজ খুনখারাবি করতে পারে, তার কি হবে? মা বহেন কা ইজ্জৎ লুঠ যায়গা তো?'

— পাহারার জন্যে কিছু জওয়ান থাকবে— বাকিরা ময়দানে।'[১১]

বলাই বাহুল্য উক্ত কথোপকথন কলকাতিয়া কাঁচি উর্দুতে হয়েছিল। বক্তৃতা শেষে

নেতাকে নিয়ে গাড়ি রাজাবাজার লক্ষ করে চলে যায়। এবার একটু ভালো করে তাকাই চারদিকে। চমকে উঠি— এখন আর ইঁটের টুকরো নয়, হাতে হাতে লাঠি, বল্লম, সড়কি— এমনি আরো কিছু অস্ত্র। এ যে দেখছি ছোটখাটো সমরসজ্জা![১২] মুসলিম পল্লীর মোড়ে মোড়ে এরা অবস্থান নেয়। বাকিরা ঘরে ফিরে যায় গড়ের মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে।

এমন সময় অদূরে 'আল্লাহু আকবর' ও 'জয় হিন্দ'-এর জোড়া ধ্বনি শোনা গেল। কাছে গিয়ে দেখি হিন্দুদের একটা মস্তো দল ছাত থেকে রাস্তার এপারে মুসলমানদের ঘরবাড়ি লক্ষ করে ইঁটপাটকেল ছুঁড়ছে। যেহেতু সম্মুখ সমর নয়— তাই বল্লম, লাঠি কি সড়কি কাজে দিল না— সনাতন অস্ত্রেই তুমুল যুদ্ধ চলল। রাস্তার ধারে অপেক্ষমাণ চারটে নিরীহ মোটর গাড়ির ঘটে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কিন্তু ছাতের সুদৃঢ় নিরাপদ অবস্থানের সঙ্গে পেরে ওঠে না মুসলমানেরা— উলঙ্গ রাজপথে মার খায় পড়ে-পড়ে। যেহেতু পূর্ব প্রস্তুতি নেই— ইঁট-পাটকেলেরও পড়ে ঘাটতি। সামনেই আমাকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন খিঁচিয়ে ওঠে : আবে খাড়ে হোকে কিয়া দেখতে হো— উও গড়িয়াঁ লেকর পাথার লে আও না!'

আমি অভিমন্যু-ব্যূহের মাঝে পড়ে ওদের আদেশ পালন করি। পায়ের ব্যথাটা উস্কে দেয়। গোয়ালাদের একটা দুধের টানা গাড়ি রাস্তার ধারে পড়েছিল— ওটা রূপান্তরিত হয় অ্যামিউনিশন ভ্যানে! কাজ করি আর একই সঙ্গে ফাঁক খুঁজি পালাবার। সুযোগ পেয়েও যাই। গড়ের মাঠের দিকে একটা মিছিল যাচ্ছিল। ঢুকে পড়ি। উদ্দেশ্য মিছিলের নিরাপদ পদযাত্রায় বাড়ি পৌঁছনো। মিছিলে কারো কারো হাতে লাঠি-সড়কি দেখতে পেলাম। বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে এরা এগোচ্ছিল সুনসান রাস্তার নীরবতা ভেঙে। উভয় দিকের বাড়িঘর যেন-বা লাশের সারি। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি— ইলুদের বাড়ি চোখে পড়ছে, দাদুর কেবিন, সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়— ঐ তো। পা আমার চঞ্চল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার ডানদিকের বেশ কয়েকটা বাড়ির ছাত থেকে শুরু হয় মুষলধারে ঢিল বর্ষণ![১৩] আশ্চর্য, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ইঁটনোর ঘটনা ছাড়া মিছিল শান্ত! টু শব্দটি নেই! অটুট মিছিল পড়ে-পড়ে মার খেতে লাগল।[১৪] বাড়ি বরাবর মিছিল আসতেই কেটে পড়লাম।

দ্রুত পায়ে নির্জন গলি পার হয়ে ভেজানো সদর দরজা ঠেলে আঙিনায় পা দিয়ে হাঁফ ছাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে তেতলায়। আমাকে দেখেই ভাইবোনেরা হৈচৈ জুড়ে দেয়। তাই শুনে আলুথালু মা আসেন, গম্ভীর চালে চাচা, ফুফতো ভাই পেছনে পেছনে। আমি বেঁচে এটা তো ওদের বিশ্বাস হয় না। মা জড়িয়ে ধরে কাঁদেন, গুরুজনদের মুখে ভর্ৎসনার খই ফোটে।

আমি মাথা হেঁট করে নীরবে আমার পড়ার ঘরে চলে যাই। কিন্তু মন আমার চঞ্চল। গড়ের মাঠে আমায় ডাকছে। কলকাতার তাবৎ মুসলমান প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের তাৎপর্য শোনার জন্যে ভেঙে পড়ছে সেখানে, আমি ঘরের কোণে মায়ের আঁচলে, এ হতে পারে না। উপরন্তু সকাল থেকে যা ঘটে চলেছে, তাতে কৌতূহলটা আরো প্রলোভনের চাপে পড়েছে। হাত চালিয়ে হাফপ্যান্ট ও শার্টটা ইস্তিরি করে

ফেলি। তাই দেখে বৈঠকখানা পল্লী থেকে আমাদের খোঁজখবর নিতে আসা চাচা ও ফুফতো ভাইয়ের উদ্বেগ। বিদায় নেবার আগে মাকে বার বার বলে গেলেন আমি যেন মিছিলে যোগ না দিই, ময়দানের সভায় না যাই।

আমরা তখন অভিভাবকহীন। বাবা প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স হাসপাতালে পেপটিক আলসার রোগে শয্যাশায়ী, অস্ত্রের অপেক্ষায়। তাই শহরের অবস্থা বুঝে আমরা কেমন আছি তারই খোঁজে এসেছিলেন চাচারা। বৈঠকখানা অঞ্চলেও নাকি দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এঁরাও বুঝতে পারেন নি ঘটনার গুরুত্ব— নাহলে অবশ্যি আমাদের মুসলিম পল্লীতে নিয়ে যেতেন ওঁরা। কথাটা উঠেছিল, তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় গিয়ে উঠব, বাবার অনুমোদন— এসব ব্যাপার ছিল। যে-কারণে ভেবেচিন্তে পরে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে চাচারা চলে গেলেন মির্জাপুর।

ওঁরাও বিদায় নিলেন আমারও অস্থিরতা বাড়ল। এঘর-ওঘর খোলা বারান্দা করছি। হঠাৎ চোখ আটকে গেল নির্জন রাজপথের ওপারের লাহাদের সেই রঙ ও ইঁটের দোকানের কাছে পদচারী এক দেহাতী মুসলমানকে দেখে। চমচমে রোদে তোলবলে শরীরে ছাতা মাথায় লুঙ্গি পরা পাঞ্জাবি গায়ে শ্মশ্রুধর লোকটা মানিকতলার দিকে যাচ্ছিল। আমার গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠল। লোকটা একাকী এভাবে নির্ভয়ে কোথায় যাচ্ছে! চিন্তার অবসর দিলে না। হঠাৎ আধখোলা রঙের দোকান থেকে পশারী ব্যাটা বেরিয়ে এসে দেহাতিকে ধাক্কা মেরে ফুটপাতে ফেলে দিলে! এরপরই ছিটকে পড়া ছাতাটা হাতিয়ে নিয়ে নির্মম প্রহার। লোকটা বাঁচার জন্যে যত কাকুতি মিনতি জানায় প্রহরের প্রচণ্ডতা তত বাড়ে। এক সময় ছাতটা ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। দেহাতি রক্তাক্ত অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে। রঙওয়ালা ছুটে যায় দোকানের ভেতর। এই ফাঁকে দেহাতি হামাগুঁড়ি দিয়ে জীবনের স্বাদ আরেকবার পেতে চায়, উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে— পারে না, হুমড়ি খেয়ে ফুটপাথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। ঐ আবার ছুটে আসছে যম, এবার রঙওয়ালার হাতে থান ইঁট। ইঁটের আঘাতে আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয় মাথা দেহাতির— মগজ ছিটকে বেরিয়ে আসে! রক্ত! রঙওয়ালার শার্টে ধুতিতে লাল রঙের বাটিকের খেলা! এই রঙটাই যে রঙওয়ালার এত পছন্দ তা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত, তাহলে আজ বাড়ি থেকে বাইরে পা ফেলত কি ঐ হতভাগা দেহাতি?

তথ্যপঞ্জি

১. 'গৃহযুদ্ধে আমি কি দেখিলাম' এই শিরোনামে আমার (লেখকের) স্কুলের ইতিহাসের খাতায় ১৬-১৯শে আগস্ট এই ৪ দিনে সংঘটিত দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখা আছে। এই খাতাটি এবং সংরক্ষিত ডায়েরি বর্তমান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২. ১৬ই আগস্ট সকাল ৬টা নাগাদ প্রথম ঘটনাটি ঘটে মানিকতলা ব্রিজে। এক হিন্দু গোয়ালাকে মারধর করা হয় এবং তার দুধের পাত্র ফেলে দেওয়া হয়। (উৎস *মানুষ*, জানুয়ারি, ১৯১১, পৃ. ৭)
১৬ই আগস্ট প্রত্যুষ। মানিকতলায় মুসলিম মিছিল বেরুল। মুখে তাদের আওয়াজ— 'লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। (*দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৮৬)
মৌলানা আজাদের মতে লীগেরই মিছিল মানিকতলা অঞ্চলে নরহত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে এবং পুলিশ দেখা যায় নি। যদিও দমদমে প্রচুর সৈন্য ছিল। শহরে শান্তি রক্ষার্থে তাদের ডাকা হয় নি। (প্রাগুক্ত)

.... তদানীন্তন ছোটলাটের ঐদিনকার [১৬ই আগস্ট] একটি প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ : 'সকাল ৭টা থেকেই উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানিকতলা এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে দিনের বাকি অংশে তা চলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্র হিসেবে প্রধানত ইঁটের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে হয়।... (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *জিন্না/পাকিস্তান : নতুন ভাবনা*, পৃ. ২৩৯)

** আজাদের উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে জানাচ্ছি : ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আমি ঘটনাস্থলে থাকা অবস্থায় কোনো হত্যা কি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে নি। তবে পুলিশ এবং সৈন্য না হলেও সেনা পুলিশ দেখেছি— যদিও তাদের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক ছিল না। যে-কারণে দাঙ্গার প্রবণতা বাড়ে এবং শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।— লেখক

৩. স্পেন্স নাকি ওয়াভেলকে বলেছিলেন : 'হিন্দুরাই উস্কানি দিয়েছে'। উত্তর কলকাতার [অর্থাৎ মানিকতলা অঞ্চলের] মুসলমানদের প্ররোচনা ব্যতিরেকে হঠাৎ আক্রমণ করা হয়েছে।.....' (*দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৮৬)
ইস্পাহানি জিন্নাকে জানান, শান্তিপূর্ণ মুসলিম মিছিল আক্রমণ করা থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত।' (*দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৮৬)

** শান্তিপূর্ণ মিছিলে আক্রমণ হয়েছিল এটা ঠিক। কিন্তু এই আক্রমণের আগে থেকেই দাঙ্গা চলছিল। তবে কি মুসলমান পিকেটারের দ্বারা হিন্দু গোয়ালাকে মারধর ও দুধের পাত্র ফেলে দেয়া সম্পর্কে যা শুনেছি এবং দেখেছি তা থেকেই দাঙ্গার প্রকৃত সূত্রপাত?— লেখক

৪. কলকাতায় নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজবিরোধী মুসলমান, সরকারি পুলিশ ও তাঁর হাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট সেই দৈত্য কলকাতার ওপর ছেড়ে দিলেন তিনি [সোহরাওয়ার্দী]। (*দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯১ পৃ. ৮৫)

** ১৬ই আগস্ট ও তার পরবর্তী দিনগুলোয় কলকাতার ওপর দিয়ে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ ঘটেছিল তাতে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই হয়। একটি ঘটনা ছাড়া আমার চোখে দ্বিতীয় নজরে পড়ে নি। যথাস্থানে এ প্রসঙ্গ আসবে।— লেখক।

৫. "এরপর আক্রান্ত হয় মানিকতলা মোড়ে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ইতোমধ্যে লীগক্যাডাররা লাঠিসোটা নিয়ে হিন্দুদের দোকান বন্ধ করার জন্য জোরজবরদস্তি করতে থাকে। 'দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাতও ভোর না হইতেই শুরু হইয়া যায়।" (*প্রবাসী*, আশ্বিন/*উৎস মানুষ*, *জানুয়ারি* ৯১)

** 'দেশবন্ধু' লুঠ হতে তো নিজেই দেখেছি, কিন্তু ঐ যে বলা হচ্ছে দোকান বন্ধের ব্যাপারটা— এটা আমার চোখে পড়ে নি। আমি যখন ঘটনাস্থলে তখন ৭টা সাড়ে সাতটা হবে। দোকানপাট বন্ধই দেখি। এমন হতে পারে জোরজবরদস্তি বন্ধ করার ঘটনাটা আমার পৌঁছানোর আগেই ঘটে গেছে। প্রহারের কাজটি তো চলছিলই, তবে ছুরিকাঘাতের ঘটনা আমার চোখে পড়ে নি।— লেখক

৬. এতদিন পরে 'কান মে বিড়ি মুখ মে পান লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই শ্লেষাত্মক উর্দু-ছড়াটির মর্ম উদ্ধার হলো। বিড়ি ও পানির সঙ্গে মিঠাই-ও যোগ হলো এই যা!

৭. "ফজলল হক [বহুল প্রচলিত ফজলুল বানানটির করুণ দশা!] কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতে চাইলেন। হাইকমান্ড আপত্তি জানাল। বাঙালি হিন্দু এক ভগবদ্দত্ত সুযোগ হারাল আর বাংলার ঐক্যের কফিনে আর একটি পেরেক বসল।
"১৯৪৬-এর নির্বাচন অন্তে সুরাবর্দী [অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো একজন বিজ্ঞ গবেষক-লেখকের হাতে সোহরাওয়ার্দী বানানের কি বিকৃতি। এ ধরনের অজ্ঞতাও এই উপমহাদেশের জন্যে কম অকল্যাণ বয়ে আনে নি।] হকের মতোই সংকটে পড়লেন আর কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়ালেন। আবার বাদ সাধল হাইকমান্ড ও কংগ্রেসের ভাগে মন্ত্রী সংখ্যা নিয়ে বিরোধ। এর অবশ্যম্ভাবী ফল— সুরাবর্দীর উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগদান।" (অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস', *দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ৮৯, পৃ : ৮৫) যার ফলে (বোধকরি কংগ্রেসকে এবং সেই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক শত্রু জিন্নাহকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য) সোহরাওয়ার্দী মওকা বুঝে ১৬ই আগস্ট ও পরবর্তী ৩ দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজের ভূমিকাটুকু বেশ স্পষ্ট করেই তুলে ধরলেন। "পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ফজলুল হক বঙ্গীয় আইন সভায় বললেন— কখন কোথায় গোলমাল বাধবে তা যদি পুলিশ বুঝতে না পেরে থাকে, তাহলে তাদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন?" (*মডার্ণ রিভিউ*, অক্টোবর, ১৯৪৬)।

** পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার কথা তো ওপরে উল্লেখ করেছি, যে তরফ থেকে শুরু হোক, ঢিল ছোঁড়াছুড়ি চলছে, কিন্তু তা বন্ধের কোনো চাঁড় নেই পুলিশের! বহুল কথিত লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলরুমে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকার কথা আমাদের জানিয়ে দেয় তিনি ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন না। কিন্তু একটা প্রশ্ন : দাঙ্গা বাধার আগে না পরে, যখন দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তখন, স্বভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি?— লেখক

৮. এই যুগল শ্লোগান লক্ষণীয়। দাঙ্গার রূপটা তখনও ঐ ষোলোই-এর সাতসকালে পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয় নি— ফলে উভয় সম্প্রদায়ের নেতা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আ. এন. এ.)-র সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর এবং তাঁর স্বপ্ন 'জয়হিন্দ'-এর শ্লোগান। এই শ্লোগান পরে 'বন্দেমাতরম' জায়গা করে নিয়েছিল।— লেখক

৯. "…. মেয়েরাও কিছু কম ছিলেন না। সেই আক্রুর যুগেও ১৯৪৬ সালে তাঁরা ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।" (*পরিবর্তন*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬, পৃ. ২৯)

১০. "... এইচ. এস সুরাবর্দী ছিলেন নাটের গুরু। তাঁরই কথায় কলকাতায় মুসলিম নিম্নশ্রেণী উঠত, বসত।" *দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ৮৯)

** তাহলে দেখা যাচ্ছে বীভৎস এ দাঙ্গায় কলকাতায় একটি বিশেষ নিম্ন মুসলিম শ্রেণিই ছিল সব কিছুর মূলে, যাদের কলকাতার মাঠে নামিয়ে দিয়ে "তিনি [অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী] বা জিন্না কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। জিন্না বুঝতেও পারেন নি ১৬ই আগস্ট তিনি রুবিকন অতিক্রম করছেন, পাকিস্তান না নিয়ে আর ফেরবার উপায় নেই।" (*দেশ*, ২১ জানুয়ারি, ৮৯)
"এই দাঙ্গা সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত মত, গুণ্ডা-দুর্বৃত্তরাই হত্যা এবং লুণ্ঠনে মেতে উঠেছিল। এটা ঠিক নয়। শুরু হয়ত তারাই করেছিল; কিন্তু পরে মধ্যবিত্তরাও নেমে পড়ে (*উৎস মানুষ*, প্রাগুক্ত)। 'আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকেও হত্যা ও লুণ্ঠনে প্ররোচনা দিতে দেখা গিয়াছিল।" (*শনিবারের চিঠি*, ভাদ্র, ১৩৫৩)— লেখক

১১. কংগ্রেস তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বক্তব্য এখানে অমূলক প্রতিপন্ন। কলকাতার জনসংখ্যার ৮০ ভাগ যেখানে হিন্দু এবং মুসলমান মাত্র ১৭-১৮ ভাগ— সেখানে সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কল্পনা ভারি আজগুবী শোনায় নাকি? আর যদি ধরেই নিই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে, তাহলে তো অস্ত্রসজ্জিত মুসলমানদের ১৬ই আগস্টের ভোর থেকেই একযোগে সমস্ত কলকাতা জুড়ে হিন্দু পল্লীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু আমরা ক্রমশ দেখব, মানিকতলার ঐ গোয়ালার দুধ ফেলে দেয়ার তুচ্ছ ঘটনা থেকে যার যাত্রা শুরু— সারাদিন লেগে গেল তা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে। আর মজা কি, অস্ত্র বলতে ঐ তো সামান্য ইঁট! আরো মজা, মুসলমানদের আত্মরক্ষাটাই ছিল মুখ্য। তাইতো পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষার জন্যে কিছু যুবককে পাহারায় রেখে বাকিদের ময়দানে যাবার আহ্বান।

১২. রাস্তার ধারে এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অপ্রতুল ইঁটপাটকেল দিয়ে যুঝতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল সকাল থেকেই। শুধু কি তাই, বাড়ি-বাড়ি ছাতে-ছাতে পূর্ব পরিকল্পনা মতো জড়ো করা বিপুল পরিমাণ ইঁটের আক্রমণে হতবাক মুসলমানেরা আত্মরক্ষার জন্যে নতুন অস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। তাছাড়া ইঁটপাটকেলের লভ্যতাও কমে গিয়ে শূন্যের কোঠায় পৌছেছিল। তাইতো দিন যত দুপুরের দিকে গড়াচ্ছিল অস্ত্রের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছিল।

১৩. পাঠক, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন হয়তো, ময়দানমুখো যে-কটা শান্তিপূর্ণ মিছিল যাচ্ছিল তার সবকটার ওপর অযথা ছাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ইঁটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। প্রথম দিকে মিছিলে কোনো লাঠিসোটা দেখি নি আমি। কিন্তু গায়ে পড়ে দাঙ্গা বাধাবার চক্রান্ত লক্ষ করে ১০/১১ টার পর থেকে যে মিছিলগুলো যাচ্ছিল তাতে লাঠিসোটার উপস্থিতি লক্ষ করছিলুম। কিন্তু এই লাঠিসোটা আমি প্রয়োগ হতে দেখি নি।

১৪. এই-যে পড়ে-পড়ে মার খাওয়া এর মূল কারণ সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা অতিক্রম করছিল মিছিলটা। কাজেই মুখ বুজে মার সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না মিছিলকারীদের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার দেখা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে প্রথম বলি দেহাতি মুসলমানের বীভৎস ও অসহায় মৃত্যুতে আমার বালক-মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়ানো হেমলকের পাত্র আমাকে আন্দোলিত করল। কিন্তু আশৈশব লালিত সহজ-সরল নিষ্পাপ মনটা কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে ছটফট করছিল। অসহায় মার কিছু বলার নেই— সন্তানদের মঙ্গল কামনায় নিরন্তর অশ্রু ঝরানো ছাড়া। অসুস্থ বাবা প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স হাসপাতালে অস্ত্রের অপেক্ষায় শয্যাশায়ী। এ সময় বাবার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন ছিল।

আপার সার্কুলাপর রোড ধরে পর পর গড়ের মাঠমুখো কয়েকটি শ্লোগানমুখর মিছিল যেতে আবার চঞ্চল হয়ে পড়লাম। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে কোনো সাড়া শব্দ নয়— কলকাতা যেন আর কলকাতাতে নেই— লোকলস্কর গাড়িঘোড়া নিয়ে কোথায় যেন পালিয়েছে। চমচমে রোদ জনশূন্য তাতাল মহানগরীর চেহারাটাই দিয়েছিল পাল্টে। এমন সময় সমবেত কণ্ঠে 'হিন্দু-মুসলমান এক হো' 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' রবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সুকিয়া স্ট্রিট থেকে একটা মিছিল বড় রাজপথে পড়ল।

চিলেকোঠায় উঠে দেখি সুমুখ সারিতে যারা রয়েছেন তাদের হাতে লাল সালুতে হিন্দু-মুসলমান শান্তি কমিটি শীর্ষক ব্যানার। উদ্যোক্তা কমিউনিস্ট পার্টি। শান্তি কমিটির এই মিছিল দেখে সোয়াস্তি হলো। তা'হলে দাঙ্গা বন্ধ, ময়দানে যাওয়া চলবে। মা কিন্তু অন্য কথা বলেন— শান্তি কমিটি না ছাই! ওঁর চোখেমুখে অশান্তির ছায়া। আমি নাছোড়বান্দা। সিটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া বড় ভাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঐ সসেমিরা মুহূর্তে বৈঠকখানা থেকে মহাচিন্তিত চাচার পুনরায় উদয়। সারা মির্জাপুর এলাকা জুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রাণ বাজি রেখে তাঁকে আসতেই হলো। মা যেন বুকে বল পেলেন। সঁপে দিলেন হঠকারী আমাকে ও ভিতরবুদে বড় ভাইকে তাঁর নিরাপদ জিম্মায়। চাচা অগত্যা আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে এগোলেন।

রাজাবাজারের মোড়ে যখন পৌঁছুলাম তখন সূর্য মধ্য গগনে। এখানে যে কিছুক্ষণ আগে মহাপ্রলয় ঘটে গেছে টের পেলুম রাস্তা জুড়ে ডাস্টবিন, ভাঙা দোমড়ান মোটর গাড়ি, পোড়াকাঠ ও স্তূপীকৃত নানা জঞ্জাল দেখে। অর্থাৎ ব্যারিকেড— যাতে টহলরত মিলিটারি লরি কিংবা অন্যান্য যানবাহন চলাচল করতে না পারে। পূর্ণ হরতাল, কাজেই— ! এই জঞ্জালের মাঝে পুড়ে কঙ্কাল হয়ে যাওয়া একটা মিলিটারি লরিও আবিষ্কার করলাম।[১] কেশব সেন স্ট্রিট ও নারকেলডাঙার অদূরে কলকাতিয়া

মুসলমানদের ভিড়। অল্প আগে এখানে যে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া হয়েছিল তার অবশিষ্ট ধোঁয়া ও গন্ধ চোখে-নাকে জানান দিয়ে গেল।

শহরের যা অবস্থা, কাজেই ময়দানে যাওয়ার আগে দল ভারী করার জন্যে চাচা আমাদের নিয়ে বৈঠকখানায় চললেন। ওখানে ৯০/১ বৈঠকখানার মেসবাড়িতে রয়েছেন আমাদের কিছু স্বজন। স্কুলের সতীর্থ লেনিনের[২] সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে চাচা ও স্বজন সমভিব্যাহারে কালী সোম স্ট্রিটের মোড়ে আসতেই অনেক লোকের সমাগম দেখলাম— সবার চেহারায় একটা পৈশাচিক উন্মাদনা। নেংলা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বস্তিবাসী 'কিং কং' (একে প্রাচীনদের নিশ্চয়ই মনে আছে,— ওর আসল নাম কি কারো জানা নেই)-কে দেখলাম একটা সড়কি হাতে ছোটাছুটি করছে— ওর পেছনে পেছনে বখে যাওয়া কিছু কলকাতিয়া। কিন্তু ওকি! একটা ঠেলাগাড়ি আর তাতে একটা নয়, দুটো নয়, স্তূপাকার নানাবয়েসী রক্তাক্ত তাজা লাশ! লাশের ওপরে লাশ! কাদের লাশ? সতীর্থ রবীনদের বাড়ি তো কালী সোম স্ট্রিটেই— এখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের ধারেকাছে.....। তবে কি? লাশের স্তূপে কে নড়ে? মাথা ঘুরে যায়। এ যে দেখছি রবীনের ঠাকুরমা! ওঁর চোখেমুখে আতঙ্ক আর বাঁচার আকুল বাসনা। ঠেলাগাড়ির পাহারায় যে ছিল তার দৃষ্টি এড়িয়ে লাশের ভেতর থেকে অলৌকিক উপায়ে বেরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন রাজপথে। চুপটি করে ঘাড়টি গুঁজে মড়ার মতো পড়ে থাকেন। চারদিকে কোলাহল— সবাই ছোটাছুটি করছে। ওদিকে কংগ্রেস নেতা নওশের আলীর বাড়ির দিকে মহা জটলা ও হল্লা। ঠাকুরমা কি পড়ে গিয়ে মরেই গেলেন! না, ষাট বালাই, মরবেন কেন, আল্লাহর হাজার রহমত— ঐ তো মাথা উঁচিয়েছেন, পরখ করছেন ওঁর সর্বগ্রাসী চোখ দিয়ে রক্তখেকোদের। অতঃপর প্রথমে হামাগুঁড়ি, তারপরই উঠে পড়ে পড়ি কি মরি করিস চার্চ লেনের ওপারে আমহার্স্ট স্ট্রিটের হিন্দু পল্লী লক্ষ করে পাগলপারা দৌড় দিয়েছেন কি 'আরে আরে বুড়্‌টি ভাগ রাহি হ্যায়, পাকড়ো পাকড়ো' বলে হৈ হৈ করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে কিল-ঘুষি-লাঠি ও লাঠির মুহুর্মুহু আঘাতে ঠাকুরমাকে থেঁতলে খতম করে পুনরায় ঠেলাগাড়িতে ছুঁড়ে ফেলল পাষণ্ডরা!— লেনিন ও আমার মুখ থেকেএকই সঙ্গে বেরিয়ে আসল, 'হায় আল্লাহ্!' তাৎক্ষণিকভাবে মনে হলো যেন আমার দাদিমাকেই মারলে বুঝি ষণ্ডারা। আবার পাশাপাশি এও মনে হলো দেহাতি মুসলমানের মৃত্যু ঠাকুরমার চেয়ে এমন কোনো আরামে ঘটে নি।

হেমলকের পাত্রে চুকুম দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ল না— দর্শনেই বালকের তৃপ্তি। কিন্তু একটু পরেই রবীনদের বাড়িতে যে নারকীয় দৃশ্য দেখলাম তাতে সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে গেল। ওদের বাড়ির সামনে আসতেই দেখি অন্দর থেকে পৈশাচিক উল্লাসে মদমত্ত খুনির দল চ্যাংদোলা করে আরো লাশ নিয়ে আসছে। রবীনেরা একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। ওরা সংখ্যায় এত জন যে এতক্ষণে তো খুনেদের ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা! হঠাৎ আমার অনুভূতির অভিধান থেকে অবাক শব্দটির অন্তর্ধান ঘটে— ঐ খুনেদের দলে আমাদের গাঁয়ের খুবই পরিচিত একজন দেহাতিকে আবিষ্কার করে![৩] যার লাশ সে বহন করেছিল সে আর কেউ নয়— রবীনের মেজ বোন! জিজ্ঞেস করে

জানতে পারি ফ্রক পরা ফুটফুটে বালিকাই ছিল ওদের শেষ শিকার! রবীনের ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, মা-বাবা, ভাই-বোন, ওদের বাড়ির ঠাকুর আর স্বয়ং রবীন— ডাবকে ফুটবল ভেবে রবীন ও আমাকে কত না গোল যার যার ঝুলিতে জমা করেছি— আজ নিমেষে সব মিথ্যে হয়ে গেল।[৪]

আমার পক্ষে ওখানে থাকা আর সম্ভব হলো না। দ্রুতপায়ে চলে এলাম বড় ভাই ও চাচাদের ছোট্ট দলটার কাছে। ওঁরা তখন নওশের আলীর[৫] বাড়ির সামনে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের এক কিনারায় দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম নওশের আলী দোতলা বাড়ির ছাতে মুসলিম লীগের চাঁদতারা পতাকা! আমি ও লেনিন মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। জানা গেল ওটা উন্মত্ত জনগণের কীর্তি। নওশের জনগণের দাবি মানেন নি— লীগে যোগদানের দাবি। বাড়ির প্রধান ফটক বন্ধ— জানালাগুলোও।

অপেক্ষমাণ ক্রুদ্ধ জনতার অনুরোধ, হুকুম— সব ব্যর্থ। ফলে জনতার যত ক্রোধ ঐ সিংহদ্বারে গিয়ে পড়ে— ভেঙে পড়ে কপাট! স্রোতের বেগে ঢুকে পড়ে মানুষের ঢল। জানালার শার্শিগুলো হয় চূর্ণবিচূর্ণ। ঐ ভিড় থেকে কার্মাইকেল হোস্টেলের চার-পাঁচ জন ছাত্র কাচ বাঁচিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে যায় বাড়ির কর্তার সঙ্গে একটা রফায় আসার জন্যে। সবটাতেই আগ বাড়ানো চাই আমার— আমিও পেছনে পেছনে। উত্তেজিত কণ্ঠে বাক্যালাপ হচ্ছিল গৌরকান্তি নওশের আলীর সঙ্গে ছাত্রদের। একজন বালকের কি প্রয়োজন হতে পারে সেখানে— ভর্ৎসনা সহযোগে নিচে নেমে এলাম। নাবতেই দেখি প্রতিবেশী এক হিন্দু গৃহস্তের বাড়ি হামলা চলছে।

কিছুক্ষণ পর প্রতিনিধিত্বকারী একজন ছাত্র নিচে এসে সমবেত উত্তেজিত জনতাকে বললে, আপনারা শান্ত হোন। নওশের আলীকে তাঁর 'অতীত কীর্তিকলাপে'র জন্যে কোরান মাথায় মসজিদে তওবা করে লীগে যোগ দিতে বলা হয়েছে। ভাববার জন্যে তিনি কিছু সময় চেয়েছেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে লীগের পতাকা হাতে এক ছাত্র 'ভাবাভাবির কি আছে। হিন্দুয়ানী ছাড়বে, লীগের সঙ্গে হাত মেলাবে— এই তো হ'লো কথা যত্তোসব! দেখি দেখি পথ ছাড়ুন' বলে তর তর করে সিঁড়ি বেয় ওপরে গিয়ে ভনিতা না করে অনুরোধ জানায় লীগের পতাকাটি নিজ হাতে ছাতে ওড়াবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত মুখ খোলেন নওশের আলী। ছাত্রদের দাবি মেনে নেয়া অসম্ভব তার পক্ষে। ওঁর প্রত্যাখ্যানের ভাষা নির্মম হয়ে বাজে সকলের কানে, 'এই পতাকা স্পর্শ করাও পাপ।' একটু পরে যোগ করলেন, 'আমাকে আরো ১৫ মিনিট ভাববার সময় দাও।' পনেরো মিনিট পার হবার পর তাঁর অনুরোধে আরো পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

হলো, তবে তাঁর এই ঘন ঘন সময় চাওয়ার পেছনে কি আবিষ্কার ক'রে ছাত্রেরা টেলিফোনের লাইন দিলে কেটে। এবার কিন্তু কথা রাখলেন। পাঁচ মিনিট পরে সত্যি সত্যি আবির্ভূত হলেন নওশের আলী, ভাঙা দরজার পাশে। অকুতোভয়। মুহূর্তে হট্টগোল খতম। কংগ্রেস নেতা কি বলেন শুনবে সবাই। বললেন, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে— এই যে জোর করে কথা আদায় করাটা। ইসলামে জোরজবরদস্তির স্থান নেই— ইসলাম তো শান্তির ধর্ম— আপনারা অশান্তি ডেকে.....'

হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কোলাহলের মাঝে ডুবে গেল নওশের আলীর কণ্ঠস্বর। 'পাকড়ো সালে কো' 'মারো হারামী কো'— এইসব অশালীন শব্দে আকাশ-বাতাস কলুষিত হয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ ভিড়ের মাঝে হুটোপটি। কে কোন দিকে ছুটবে, বাঁচাবে পৈতৃক প্রাণ, সেই জরুরি ভাবনায় মত্ত জনতা একলহমায় ছত্রভঙ্গ ও উধাও! কিছু না বুঝে 'য পলায়তি স জীবতি' জ্ঞানে আমিও ছুটছি। অনেকেই প্রাণভয়ে জুতো নিয়েই নিকটস্থ এক মসজিদের অমর্যাদা করতেও কার্পণ্য করল না— আমি লোকের ভয় দেখে তাজ্জব মানি। এদের হাতেই কলুষিত হয়েছে রবীনদের বাড়ি, নওশের আলীর মুণ্ডুপাতে এদের কতনা শৌর্যের পরাকাষ্ঠা! মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে এইসব নপুংসক খুনেদের বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে দেখে হাসি পায় আমার।

কিন্তু বিপদটা কি? রহস্যটা কোথায়? পরিস্থিতির আন্দাজ বুঝে মসজিদের সদর দরজার বাইরে আসতে জটটা খুলল। অদূরে একটা মিলিটারি লরি চোখে পড়ল। তাতে একজন পুলিশ সার্জেন্টসহ কতিপয় সৈনিক। নওশের আলীর বাড়ির আশেপাশে কিছু লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে চলন্ত গাড়ি থেকেই কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মারল। ফলে আবার ছত্রভঙ্গের পালা। কিছুক্ষণ পরে গ্যাসের ধোঁয়ার প্রকোপ কমলে দেখা গেল কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর পিছু পিছু পরিবারের অন্যান্য সদস্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একে একে ঐ লরিতে উঠে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্য! নওশের আলীর গায়ে কোনো জামাকাপড় নেই— কোমরে জড়ানো একটা সাদা তোয়ালে! লীগের বর্বর সমর্থকেরা ওঁর পরিধানের কাপড়-চোপড় ছিনিয়ে নিয়েছিল আগেই! গাড়িটা মোড় ঘুরে করিস চার্চ লেনে পড়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে ছুটে চলল— ওঁকে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিতে। ঐ এলাকাতেই কিছুক্ষণ আগে রবীনের ঠাকুরমাও যেতে চেয়েছিলেন— কিন্তু হিন্দু হয়েও পারেন নি!

ইতোমধ্যে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়ানো লুকিয়ে থাকা লোকগুলো সব জড়ো হয়েছে অকুস্থলে। অপসৃয়মাণ গাড়ি লক্ষ করে তাদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়— শেম্ শেম্ শেম্।

আজ এতদিন পরে বড় ভাবতে ইচ্ছে করে, বুমেরাং হয়ে যদি ঐ 'শেম' শব্দটি আঘাত হানতে পারত সেদিন ঐ দাঙ্গাবাজ লোকগুলোকেই, জয় হতো ধর্মনিরপেক্ষ নওশের আলীর, তাহলে এই উপমহাদেশের ইতিহাসটাই যেত পাল্টে। সেদিন নওশের আলীকে উদোম করতে গিয়ে নিজেরাই যে বিশ্ববাসীর কাছে ন্যাংটো হয়ে গিয়েছিলেন তা বুঝতে বেগ পেতে হতো না তাদের।

কিন্তু তা হয় নি এবং হয় নি বলেই এরপর ক্রমে সারা কলকাতায়[৬] এবং কলকাতার পর ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল রক্তবাহী ভয়ানক দাঙ্গা, যে ঐতিহ্য আজও এই উপমহাদেশের মানবতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সে কথা থাক। আমার ডায়েরিতে কিন্তু আজকের পরিশুদ্ধ ভাবনার সবটাই স্থান পায় নি পঞ্চাশ বছর আগের রাগী অপিচ অবোধ বালক মনে। বড়দের কলুষিত মনটা কিছুটা হলেও আমাতেও ঠাঁই পেয়েছিল। এ ব্যাপারে তখনকার উত্তপ্ত আবহাওয়াও কম ইন্ধন জোগায় নি। তবে আমার মনের সুন্দরীভবনে যখন এত্তেলা পাঠাই তখন তলব

পড়ে বুড়ো হাবড়ার— সেখানে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাকে, কিছু নিকেশ হয়, বাকিটা হয় না।

কথা হচ্ছিল নওশের আলীর। ওঁর গাড়ির দিকে শেষবারের মতো তাকিয়েছি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া আমাদের দলে ফিরব বলে, আমার ডায়েরির ভাষায়— 'পাখি খাঁচা ছেড়ে তখন অনেক দূরে'।

এমন সময় পরিচিত কণ্ঠে ডাক শুনে সম্বিত ফিরে পাই।

অদূরে উত্তেজিত উল্লসিত ভিড়ের মাঝে চাচাজান ও বড় ভাইয়ের পাশে সুরুজ, মন্টু, মতি ও লতিফ সাহেবদের[৭] দলটিকে আবিষ্কার করলাম সহজেই। কাছে যেতেই চাচা জানালেন ময়দানে যাওয়া চলবে না। ডায়েরির ভাষায়, 'কারণ অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ'। রিপন কলেজে লীগের পতাকা নামানো আর কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা ওঠানো নিয়ে সকাল থেকেই ইঁটনো ও দোকান ভাঙচুর খুব চলছে। টালা শ্যামবাজার ভবানীপুরের মুসলমানদের নাকি মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়ছে। কাজেই মিছিলে যাওয়া ময়দানে বক্তিমে শোনা, নাস্তি।

স্বভাবতঃই মুষড়ে গেলাম। কিন্তু দমবার পাত্র আমি নই। সুনীতি-গগনেরা কেন নেংচানোর কথা বললে এর শেষটা একটু দেখতে হয় যে। আমার জেদের জয় হয়। চাচা অগত্যা নানা উপদেশ দিয়ে আমাকে বড় ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে পাটোয়ার বাগানে তাঁর বাড়িমুখো হলেন। লেনিনও চলে গেল। লতিফ সাহেবদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গী হলেন। আমরা কালী সোম স্ট্রিট ধরে এগোচ্ছি, দেখলাম লাশের ঠেলাগাড়ি দুটো স্বস্থানে নেই। কে বললে মানহোলে ওদের গতি হয়েছে! রবীনের কথা মনে হতেই পা টলে আসে। বিমর্ষচিত্তে পথ ভাঙি। তাহলে সেন্ট পলস্ কলেজের মাঠে আমাদের ফুটবল ম্যাচের কি হবে?— এমন উটকো ভাবনাও পেয়ে বসে! আপার সার্কুলার রোডে পড়ার আগেই 'আল্লাহু আকবর' 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ'-এর যুগল ধ্বনি কানে আসতেই পা সচল হয়। বিশাল মিছিল। অনেকের হাতেই আত্মরক্ষার হাতিয়ার— লাঠি, সড়কি আর এই প্রথম দেখলাম কারো কারো হাতে কিরীচ জাতীয় নাঙ্গা তরবারি। অধিকাংশই টালা, মানিকতলা, কারবালা ট্যাঙ্ক, নারকেলডাঙ্গা, রাজাবাজার অঞ্চলের বস্তিবাসী কুট্টি ও আপকান্ট্রির লোক।[৮] চেহারায় পোশাকে-আশাকে সহজেই চেনা যায় এদের। বাঙালি বড় একটা চোখে পড়ল না। তখন দুপুর দুটো হবে। আকাশটা মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে যাচ্ছিল। আমাদের আত্মরক্ষার কিছু নেই। এসব ভেবে আমরা মিছিলে যোগ দিই নি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই— ময়দানে নেতারা কি বলেন তাই শোনা। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ছেলেবেলা থেকেই ময়দানের সবুজটা আমায় ভারি টানত। বাবার হাত ধরে কতবার গিয়েছি বাবাদের স্কুল অভ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ক্লাবের খেলা দেখতে। জমা করেছি খেলোয়াড়দের ফেলে দেয়া সোডা ওয়াটার বোতলের ছিপি! কিন্তু এ যাওয়ার মধ্যে সবুজ নয়, লালের যোগ। হাফ-প্যান্টের পকেটে কিছু ইঁটের টুকরো পুরে নিলাম।

মিছিল শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি হতেই লক্ষ্মীকান্তপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, ব্যারাকপুর থেকে আসা কলকাতার বাইরের বেশ কিছু লোক মিছিলে যোগ দিলে।

এমন সময় উচক্কা টাওয়ার লজ ও ফলপট্টির আশেপাশের কিছু বাড়ি থেকে ইঁট বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বিনে উষ্কানিতে এমন আক্রমণ নতুন কিছু ছিল না। তাই মিছিল থেমে পড়ল না বা ছত্রভঙ্গও হলো না। উপস্থিত লাঠিসোটা আত্মরক্ষার জন্যে কোনো কাজেই এলো না। সুতরাং গা বাঁচাতে ছুঁড়ে ফেলা ঢিলগুলোই বুমেরাং হয়ে ফিরে যেতে লাগল। সকাল থেকে ইঁটনো দেখতে দেখতে ওর মজাটা পানসে হয়ে এসেছিল আমার কাছে। মিছিল এগোচ্ছে, আমরাও। বৌবাজারের মোড়ে এসেছি, এত হল্লার মাঝেও সবকিছুই কেমন সুনসান। দেখলুম রাস্তার ডানপাশে বিখ্যাত এক আনা চিহ্নিত (অর্থাৎ এক কাপ চা এক আনা) চেইন-রেস্তোরাঁ 'ফ্রেসকো' তো পুড়ে ছাই! মুসলমানেরাও এমন কোনো সাধুপুরুষ নয়— ওদের হিংস্র থাবা থেকেও রক্ষা পায় নি বেশ কিছু হিন্দুর দোকান।

বৌবাজারের মোড় পার হয়েছি কি আবার উড়ন্ত শেলের লীলা![৯] গা বাঁচানোর জন্যে মিছিল থেকে সরে এসে ফুটপাথে চলে এলাম আমরা। আমাদের দেখাদেখি আরো অনেকেই ফুটপাথকেই নিরাপদ মনে করলে। এত যে কাণ্ড, মিছিল কিন্তু শ্লোগানমুক্ত ছিল না। মন ও দেহকে চাঙা রাখার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে অন্যান্য ধ্বনির পাশাপাশি 'লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর ধুয়োও চলছিল। হঠাৎ একটা বাড়ি থেকে ঢিলের সঙ্গে সোডার বোতলও যোগ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। বিকট শব্দে ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ কাচের টুকরোগুলো অনেককেই রক্তাক্ত করতে ছাড়ল না। প্রতি আক্রমণ হতেই বাড়ির জানালা সব ঝপঝপ বন্ধ হয়ে গেল।

এ যেন নদীর স্রোত, কোনো বাধাই মানে না, লক্ষ্য— ঐ সাগর। মিছিলের স্রোতটাও এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে গড়ের মাঠের দিকে। বিনে বাধায় ক্যাম্বেল হাসপাতাল পেরিয়ে মৌলালি পৌঁছে গেলাম। এখানে এসে মিছিলটা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটা যে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে কিছু আগে তা আন্দাজ করা গেল। সারা রাস্তাজুড়ে পাথর ও ইঁটের টুকরো ও পোড়া টায়ারের গন্ধ তাই বলছে। মোড়ের ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গোছের ষণ্ডামার্কা কতিপয় গুণ্ডা।

আমাদের দলটা পৌঁছতেই ডায়েরির ভাষায় ঐ 'মুসলমান গুণ্ডা লীডার'দের একজন কাঁচি উর্দুতে যা বলল তার মর্ম হলো— শহরের অবস্থা খুব খারাপ। হিন্দুরা যেখানে সুবিধে পাচ্ছে মুসলমানদের জবাই করছে। কাজেই চোখ কান খুলে তারা যেন এগোয়। সুযোগ পেলে তারাও যেন পেছপা না হয়।

মিছিলের নেতাগোছের কিছু লোক ষণ্ডাদের সঙ্গে নিচুস্বরে কি আলাপ করে।

আমার বালক-মনে খটকা। সব ব্যাপারটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা গুণ্ডাদের দ্বারা! মূলস্রোতে থেকেও আমরা নেই। আমরা মানে বাঙালিরা। মিছিলের ভেতর মিছিল, অর্থাৎ মিছিলের সঙ্গে মিলেমিশে নয়, ভাগ ভাগ হয়ে লক্ষ্যপানে চলা। শুধু তাই নয়, ছিনতাই লুঠতরাজ এসব থেকে সাবধানে এড়িয়ে চলা। এসব খটকা নিয়ে ধর্মতলার দিকে মোড় নিই। লাঠি-সড়কিগুলো নানাভাবে নাচিয়ে দুলিয়ে, মহরমের তুলে রাখা তরবারিগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কলকাতিয়াদের সে কি উল্লাস! তাই সামনের অজানা উৎকণ্ঠার পাশাপাশি একটা উৎসবের জেল্লাও যেন সারা মিছিলের চেহারায় ফুটে উঠেছিল। ধর্মতলার সারিবদ্ধ আপিসভবন ও দোকানপাটগুলো যেন

আতঙ্কে জড়সড় হয়ে তাকিয়ে আছে জঙ্গি মিছিলটার দিকে। জনমানবশূন্য রাস্তায় প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা না দেখেই বোধকরি মিছিলের পুরোভাগ থেকে রিলের মতো ভেসে আসে হাঁক— 'লোটো ভাইয়ো, যেত্না হিন্দু দোকান'! এই প্রথমবারের মতো মিছিলটা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিনা উষ্কানিতে সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াল। এতদিন পরে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা মিছিলের নেতাদের সঙ্গে মৌলালির ষণ্ডাদের মধ্যে আঁতাতের ফলেই ঘটেছে। যাইহোক, লুঠ করার মতো এমন একটা অভিনব প্রস্তাব নানা গুজবের ভারে বিপর্যস্ত মিছিলটা এক রকম বলা চলে লুফেই নিল। বুক কাঁপানো হারে-রে-রে শব্দে তারা দোকাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা লোমওঠা কুকুর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল রাস্তার ধারে, সমবেত কণ্ঠের হাঁক শুনে এবং আস্ফালন দেখে এবার সে লেজ গুটিয়ে পালায়।

লুঠপাটের দলটা লুঠের তালে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও বাকি মিছিল কিন্তু এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে কমলালয় ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স এসে যায়। এবার মিছিলের একটা মোটা অংশকে ভারি উৎফুল্ল দেখায়। এমন লোভনীয় ভাণ্ডারের তত্ত্ব নিতে মিছিলের কার না সাধ জাগে? আর এ তো লুটেরা বলে কথা। কমলালয়ের সদর দরজা মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে। পরপর লুঠপাটের দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্ষুব্ধ একজন বাঙালি মুসলমান এর প্রতিবাদ করতে গেলে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান, বলা যায় পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু একি দৃশ্য দেখি! এক একজন দোকান থেকে বেরুচ্ছে, তাদের কারো হাতে বুকে বগলে দামি সব শাড়ি, রকমারি জামাকাপড়, কারো দু হাতে জড়িয়ে ধরা কসমেটিক্সের মস্ত বাক্স, আবার কারো মাথায় হিজ মাস্টার্সের গ্রামোফোনের চৌকোণো বাক্স তো হাতে রেকর্ডের সুদৃশ্য কেস! অনেকের হাতে দুনলা, একনলা বন্দুক ও নানা ঢঙের নানা আকারের পিস্তল শোভা পাচ্ছে— এইসব আনাড়ির হাতে তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে কতক্ষণ। এভাবে এক এক করে লুঠ হয়ে যায় কে. সি. বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান, সি. সি. সাহার গ্রামোফোনের দোকান এবং এমনি আরো বড় ছোট দোকানসহ ঝলমলে কমলালয় স্টোর্স— গতকালও যে দোকানে পুজোর ভিড় ক্রেতায় ক্রেতায় উপচে পড়েছে এর প্রতিটি বর্ণাঢ্য বিভাগ।

আমার খুব লজ্জা করছিল। বারে বারে সুনীতি-গগন-শশাঙ্কদের চেহারাগুলো চোখের সামনে এসে ভেংচি কাটছিল। আমি লুকোবার পথ খুঁজে পাই নে।

আমি বড় ভাইকে তাড়া দি, তিনি হাঁ করে সব দেখছিলেন। ওদিক থেকে সুরুজ ভাই বলে উঠলেন, এসব হাঙ্গামায় আমাদের না থাকাই ভালো। পুলিশটুলিশ এলে বিনে অপরাধে হাতে হাতকড়া পড়বে না এমন দিব্বি কেউ দেয় নি।

হঠাৎ পুলিশ প্রসঙ্গ উঠতে আমাদের টনক নড়ে। আচ্ছা, এই যে এতটা পথ ভাঙলুম, এত ইঁটোইঁটি হলো, দোকান লুঠপাট হলো এবং এখনও নাকের ডগায় চলছে, সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা বন্দুক-পিস্তল লুঠ করে দাবড়ে বেড়াচ্ছে রাস্তা জুড়ে— কৈ, একটা লালপাগড়িরও তো চোখে পড়ল না! এরা কি সব থানা-ফাঁড়িতে খইনি টিপে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে?[১০]

তথ্যপঞ্জি

১. দাঙ্গার প্রথম দিনেই যে মিলিটারি রাজপথে নেমেছিল, এই ঘটনা আরেক প্রমাণ।

২. বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহারের নিকট আত্মীয়। লন্ডনের লোকান্তরিত।

৩. আমার চোখে দেখা এই প্রথম ও শেষ বাঙালি দাঙ্গাবাজ মুসলমান। গ্রাম থেকে আসা এই যুবাকে বাবা চাকরি দিয়েছিলেন ওঁর কর্মস্থলে। অনুতপ্ত এই যুবক আজীবন অনুশোচনার জ্বালা বুকে পুষে বছর দশেক আগে সব জ্বালা জুড়িয়েছে।

৪. দাঙ্গার ২/৩ মাস পরে পূরবী সিনেমার অদূরে শেয়ালদামুখো বাঁ পাশের ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছি আমার পা অনড়, চোখ স্থির— রবীন ও ওর ছোট বোন না! ভূতে বিশ্বাস নেই, যদিও ভূতের গল্প পড়তে কি শুনতে ভালো লাগে। না, সতীর্থ রবীনই আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর স্থির নিবদ্ধ সজল চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারলাম শুধু, রবীন, তুই!' ওর শ্লেষমাখা জবাব, হ্যাঁ, আমি। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে, 'তোরাই তো মারলি।' আমি জবাব থাকলে তো দেব। ওর আর ছোট বোনটার বেঁচে যাওয়ার কাহিনী বললে ও ধরা গলায়। ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ওরা ভাইবোনে বেড়াতে গিয়েছিল ওদের দিদা (মাতামহী)-র কাছে। ওখান থেকেই শুনতে পায় ওদের বংশের পতনের খবর এবং এভাবে ভাগ্যক্রমে ওদের বেঁচে যাওয়া, যা মরে যাওয়ারও বাড়া।

৫. স্বাধীনতাউত্তর কালে কংগ্রেসের টিকিটে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য। পূর্ববঙ্গের যশোর জেলা অধিবাসী হলেও, দেশ বিভাগ মেনে না নেয়ায় ভারতেই থেকে যান— আর দেশে ফেরেন নি। এই অকুতোভয় রাজনীতিবিদ ষাটের দশকে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. কলকাতার দাঙ্গায় হত্যাকাণ্ডের চিত্রটি তুলে ধরছি 'উৎস মানুষ' জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যা থেকে :
হতাহতের সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। *মডার্ন রিভিউর* হিসাবে মৃত ৬ থেকে ৮,০০০; আহত ১৫-২০,০০০; স্টেটসম্যান-মৃত ৪,০০০; আহত ১১,০০০; *মর্ডার্ন ইন্ডিয়া*— মৃত ৪,০০০; আহত ১০,০০০।
চার দিনের দাঙ্গায় গৃহচ্যুত হয়েছেন ১০,০০০ মানুষ। [এই সংখ্যা পরে আরো অনেক বাড়ে।] হত্যাকারীরা বহু মৃতদেহ খালে-গঙ্গায়-নর্দমায় ফেলে দেয় (এর প্রত্যক্ষদর্শী বক্ষ্যমান লেখক নিজেও, যা পরে আলোচনায় আসবে)। ঘটনার সাতদিন পরেও নর্দমা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় (দি স্টেটস্‌ম্যান, আগস্ট)। ২৬ তারিখ পর্যন্ত হিসাবে কলকাতা-হাওড়ায় রাস্তা থেকে মোট ৩,৪৬৮টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল (ক্যালকাটা *মিউনিসিপ্যাল গেজেট*, ২৪ আগস্ট— ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)।
ইউনিভার্সাল এনসাইক্লোপিডিয়ার হিসেবে : মৃত— প্রায় ২৫,০০০; আহত ৪৩,০০০; গৃহহারা ১০,০০০ এবং ক্ষয়ক্ষতি ১০,০০০,০০০ পাউন্ড।
দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৯৯০ সংস্করণ : মৃত— ৪,০০০।

৭. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে বাবা, পাছে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে, তাই আমাদের নিজের কাছে রেখে মা ও ভাইবোনদের দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তখন বৌবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাবা আমাদের নিয়ে ওঠেন ৯০/১ বৈঠকখানা রোডের হাফমেসবাড়িতে (যা পরে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিনে নিয়েছিলেন)। এই মেসবাড়িতেই লতিফ সাহেবদের সঙ্গে পরিচয়। এই লফিত সাহেব ছিলেন এক অপূর্ব চরিত্র।অফিস ফেরৎ বাড়িতে বয়ে ফলমূল যাই আনুন না কেন— ভাগ দেবেন সবাইকে। যদি একটা আপেল আনেন কুঁচি কুঁচি করে কেটে খাওয়াবেন তা মেসের বারো জন সদস্যকে— একাকী, একেবারে না!

৮. আমার ডায়েরিতে লেখা আছে 'বিশেষত কলকাতায় অবস্থিত ব্যক্তিগণ'— অর্থাৎ কুট্টিগণ। কলকাতার (বৃহত্তর সুতানুটি, গোবিন্দপুর, ভবানীপুর, কলকাতা ও মেটিয়া বুরুজ এলাকার) আদিবাসী বাঙালি মুসলমানেরা পেশায় ছিল মূলত কৃষিজীবী। বহু পূর্বেই ধনাঢ্য হিন্দু ব্যবসায়ী,

মুৎসুদ্দি ও উঠতি উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং তৎকালীন ইংরেজ প্রভুদের কাছে তাদের জমিজমা একে একে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। মহীসূরের টিপু সুলতান ও লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের বংশধর ও তাদের লোকলস্কর কলকাতার বুকে এক অবাঙালি মুসলমান সমাজ গড়ে তোলে। এবং আরো পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে, বিহার থেকে আগত দেহাতি মুসলমান ঐ সমাজে এসে ভিড় জমায়। এদের অধিকাংশই বিত্তহীন এবং অশিক্ষিত। এই বিত্তহীনেরাই পরবর্তীকালে কুট্টি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর যারা সমাজের সঙ্গে মিশতে পারল না, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মুঙ্গের কি ছাপড়ার যোগাযোগটা রক্ষা করে চলত, খোট্টা নামেই পরিচিত ছিল ওরা। এরা পেশায় কেউ কসাই, সেউ নাপিত, গাড়োয়ান, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, মুটে, পানওয়ালা অথবা ফেরিওয়ালা। এদের ভাষা প্রধানত কাঁচি উর্দু এবং প্রয়োজনে ভাঙা বাংলা বলতেও পারঙ্গম। যে-কারণে মেদিনীপুরের উর্দুভাষী সোহরাওয়ার্দী কলকাতাবাসী বহিরাগত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সংখ্যালঘুদের চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বস্তিবাসী কুট্টি ও খোট্টাদের প্রতি রাজনৈতিক কারণে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন— ভোট যেমন মিলত প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার কাজটাও মিটত। তাই মিছিলে জঙ্গি অংশটা কুট্টি শ্রেণিভুক্ত হওয়াটার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৯. 'তবে মিছিল যেমন জঙ্গি এবং সশস্ত্র ছিল, হিন্দুদের তরফ থেকে তার ওপর আক্রমণও হয়েছিল। শিয়ালদহের হিন্দুরা বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলের ওপর ইঁট ছুঁড়েছে— এই দৃশ্য দেখেছেন সোমনাথ লাহিড়ী (বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা, সুবক্তা ও সুলেখক)। মেছুয়া বাজারে তিনি দেখতে পান, মুসলমানেরা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আছে (*উত্তাল চল্লিশ*, পৃ. ১৮১-৮২)।' তবে হিন্দুরা আক্রমণ না করলে দিনটা 'বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে' কেটে যেত— তাঁর এই ধারণাকে আমি সমর্থন করি। কারণ সকাল থেকে আরম্ভ করে মিছিলের ও অন্যান্য ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তব্যকে সমর্থন না করে পারি নে। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণার পর থেকে হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিটি রাত, বিশেষ করে, ১৫ আগস্ট রাতে ঘুমাতে যায় এক গভীর আতঙ্ক বুকে নিয়ে। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল মুসলমানেরা হিন্দুদের শেষ করবেই। কিন্তু ঘটনা বলে ১৬ই আগস্টের সকাল ৭-১৫য় মেডিক্যাল কলেজে প্রথম যে আহত ব্যক্তি ভর্তি হয় সে এক মুসলমান কাঠের মিস্ত্রি। তিনি ছুরিকাহত হন কেশব সেন স্ট্রীটে। আর আমি নিজে চোখে যে হতভাগ্য দেহাতি মুসলমানের মৃত্যু দেখেছি তাতো ঐ সকাল ৭টার দিকেই

১০. *মর্ডান রিভিউ*, অক্টোবর, ১৯৪৬/*উৎস মানুষ*, জানুয়ারি, ১৯৯১। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় অভিযোগ করে বলেন, 'কখন কোথায় গোলমাল বাঁধবে তা যদি পুলিশ বুঝতে না পেরে থাকে, তাহলে তাদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন? পুলিশের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সঙ্গে ১৬ই আগস্টের পূর্বে আকরম খান, জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আশ্বাস বাণীর কোনো মিল নেই। তাঁরা বলেছিলেন ১৬ই আগস্ট কোনো হিংসাত্মক চেহারা নেবে না। সোহরাওয়ার্দী তো আইন সভায় ঘোষণাই দেন— লীগ হিংসা বা হুমকির আশ্রয় নেবে না— এটাই পরিকল্পনা (*হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ১৬ আগস্ট ৪৬)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের পথ চলা আবার শুরু হয়। লুটের মাল নিয়ে যারা ভাগবার ভেগে গেছে। ছত্রভঙ্গ বেদাঁড়া মিছিলটা এবার চাঙা হয়ে সুমুখ পানে ধায়। নরমোহন সিংহ লেন-তালতলার মোড় পার হচ্ছি, চোখে পড়ল ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক অ্যাডভান্স-এর দপ্তর। কোনো ছুতো খুঁজে পেলে, কিংবা না পেলে ছুতো বানিয়ে, গরম-গমর খবর পরিবেশেনায় এর জুড়ি সেকালে একমাত্র বাংলা সান্ধ্যদৈনিক 'ভগ্নদূত'-এরই ছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে এদের রটনাও কম ইন্ধন জোগায় নি।

কিছুদূর এগোতেই একটা গলির মুখে ধর্মতলার দিকে মুখ ফেরানো ছ'তলা ভবনের সব ওপরের ঝুলবারান্দায় দাঁড়ানো এক টেকো বুড়ো হাবড়ার অঙ্গভঙ্গি ও অবোধ্য চিৎকার সকলের নজর কাড়ল। মিছিলের যে অংশটা থমকে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎই, কাউকে বুঝতে না দিয়ে, টেকুয়া লোকটা ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগল তাদের ওপর! মিছিলের কেউ কেউ আহত হলো। অনেকে ঝুলবারান্দা লক্ষ করে অযথাই ঢিল ছুঁড়লে— লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিচে নেমে এসে নিজেদেরই বিপত্তি ডেকে আনল তারা। অগত্যা সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল ফ্ল্যাটের পাশে দাঁড়ানো একটা ফোর্ড গাড়ির ওপর। সবাই চড়াও হলো— চড়া ব্রহ্মতালুর গুণে নিমেষেই ফোর্ডের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। বোধকরি গাড়ির মালিক হবেন ঐ টেকুয়া, নাহলে বোতল থেকে কেন উনি ছুঁড়বেন অ্যাসিডে ফোয়ারা! ঐ শূন্য থেকে ঝরে পড়া অ্যাসিডের ছিটেফোঁটা কারো কারো গায়ে লাগল বটে, তবে জামাকাপড় ছেদা হয়ে যাওয়া ছাড়া খুব একটা ক্ষতি হলো না কারও। যুদ্ধরঙ্গ লোকটা যে বেশ তৈরি হয়েই নেবেছেন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের অবাক হওয়ার পালা তখনও শেষ হয় নি। কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাওযা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভদ্রলোক মাটির একটা কলস হাতে আবার উদয় হলেন। দু'হাতে শুন্যে তুলে উপুড় করতে যাবেন, তলার অংশ ভেঙে গিয়ে কলসের পানি ঝরে পড়ল টেকার শুভ্র চাঁদিতে আর বাকিটা নিচেয়। হাত-পা ছুঁড়ে ভদ্রলোকের সেকি চিৎকার! হবে না, গরম জল যে! মিছিলে একটা হাসির রোল ওঠে। এমন বাঘের আড়ি এ জন্মে দেখি নি। ওমা! সেকি! যুদ্ধরঙ্গ প্রবীণের হাতে এবার যে আস্ত তলোয়ার! নেচে নেচে এলোপাতাড়ি তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে থেমে থেমে এই হেঁড়ে বোল : জয়হিন্দ! জয়হিন্দ! জয়হিন্দ![২]

যথেষ্ট নাটক হলো। আমরা আবার সামনের দিকে এগোই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে, ঐ যেখানে চেটোনেটো ঘেরাও করা জায়গায় ফি বিকেলে বক্সিং খেলা চলে, সেখানে এসেছি, বেশ থমথমে ভাব। হবে না, স্কোয়ারে রাস্তার ধারে যে প্রাচীন

মসজিদটা ছিল, ওটা যাচ্ছেতাইভাবে এঁটো করে দিয়েছে হিন্দুরা। ওয়েলেসলি-এলিয়ট রোডের মুসলমানেরা তাই নিয়ে একাট্টা লড়বে বলে ক্রাউন সিনেমার আশেপাশে জড়ো হয়ে হম্বিতম্বি করছিল। মন্দির সব এবলিশ্ করে দেবে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ও তারা ঘোষণা করছিল। কিন্তু মসজিদটাকে বাঁচাবার জন্যে যে কজন এগিয়ে আসল তাতে দমে গেল অগ্রবর্তী দলটা। অদূরে বিধ্বস্ত নিঃসঙ্গ মসজিদটার দিকে তাকিয়ে আমার বালক-মনেও একটা ক্রোধ জন্ম নিল। আমিও সঙ্গ দিতে চাইলুম। চাচা সঙ্গতঃকারণেই আমার পাকামোয় ধমকে উঠলেন।

কিন্তু ওকি, রাস্তা জুড়ে দোমড়ানো-মোচড়ানে এত এত বই! পত্রিকার ছেঁড়া পাতা! ওয়েলিংটন-ধর্মতলার মোড়ের রক জোড়া পুরানো বইয়ের দোকানটাকে ন্যাংটো করে ছেড়েছে লুটেরার দল। আরো যত এগোই, দেয়ালেন দেয়ালে যে পুরানো বইয়ের দোকানগুলো, সবারই অবস্থা দিগম্বর। পেঙ্গুইন সিরিজ ও জি আই ব্লুদের জন্যে সস্ত াদামের ছিন্নভিন্ন পকেট-বুকগুলো আর কমিক বইয়ের লোভনীয় সচিত্র রঙিন পাতাগুলো মিছিলের অগুণতি পায়ের চাপে পড়ে ক্রমাগত রং বদলাচ্ছিল। আস্ত কিছু 'ইলাস্ট্রেটেড ক্ল্যাসিক্স' কুড়িয়ে নিলাম। আর এসব দোকানের মালিক তো কলকাতিয়া মুসলমান। কলকাতার পুরানো বইয়ের বিক্রিবাট্টা এদেরই তাঁবে যে।

হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মিছিল অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভাঙা দলটা এবার জোরকদমে এগিয়ে চলে। তবে সুযোগ পেলেই হিন্দুদের দোকানগুলো সাবড়ে দিতে কার্পণ্য করছে না! কৌতূহলী পুরবাসী আধখোলা জানালার ফাঁকে কিংবা বারান্দার আড়ালে তরাসে তাই দেখে। দেখতে দেখতে জ্যোতি নিউ সিমেনা পার হয়ে ওয়াসেল মোল্লা। এমন সময় শোরগোল, কি, না, 'এই দোকান লুটোনাকো, এ যে আবেদ আলী সুবেদ আলীদের দোকান গো!' হাত সব গুটিয়ে নেয় বদমাশের টেক্কার দল। এবার উলের রাজা এলো মল্লিক ছাড়িয়ে, চার্চের (সেন্ট্রাল এপিসকোপাল মেথডিস্ট চার্চ?) দোরগোড়ায়— না আজকে লটারির টিকিট নিয়ে কেউ ঘণ্টা বাজায় না। হ্যাঁ, এই তো, এবার বাঁ হাতে লাহাদের রঙতুলির দোকানকে পাশ কাটিয়ে— এসপ্ল্যানেড!

যেদিকে তাকাই মানুষের ছোট ছোট দল। ট্র্যামের ট্যাং ট্যাং নেই, রিক্সার টুংটাং নেই, নেই মোটগাড়ির ভেঁপু, হোয়াইটঅ্যাওয়ের সাহেব-মেমরা কেনাকাটা পাটে তুলেছে, ওদিকে মেট্রোর ম্যাটিনী বন্ধ— এ কেমন ধারা চৌরঙ্গী! অক্টারলোনির ওপাশে যেখানে সভার জায়গা করা হয়েছে, আমাদের ছোট দলটি সেদিকে পা বাড়াতেই চোখ পড়ে মাক্ষুরাম বুক স্টলের বৃত্তাকার জায়গাটা খা খা কছে— কিছু ইঁটপাটকেল আর ভাঙা তক্তপোষের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। না, তেমন একটা লোক সমাগম হয় নি। তবে শহরের যেমন বেগোছ অবস্থা সে তুলনায় লোক একটা মন্দ হয় নি। স্পোর্টিং ইউনিয়নের যে নতুন ক্লাবটেন্ট হচ্ছিল, তার পাশেই জায়গা করে নিলাম আমরা। সকালের চোখেমুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ। অধিকাংশই কলকাতিয়া ও নিম্ন শ্রেণির উর্দুভাষী। চিন্তা এদের ফেলে আসা মহল্লাগুলোকে ঘিরে। লীগের ডাকের কারণেই তারা ময়দানে এসেছে— নতুবা বুড়ো মা-বাবা, ভাইবোন, সন্তানদের ফেলে কারও ময়দানে আসার ইচ্ছে ছিল না। হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেইডল-র ঘড়িতে তখন চারটা

বাজে। একে একে হবু ও পাতি নেতারা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। যতদূর মনে পড়ে সেকালের ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান ঘোষকের কাজটা করছিলেন। বাংলা, উর্দু ও পণ্ডিতি ফলাবার জন্যে কিছু অবোধ্য আরবি স্তোত্রও পাঠ করছিলেন তিনি।

এমন সময় 'হিন্দুরা ঠ্যাঙাতে আসছে' এমন একটা ভয়ঙ্কর উত্তেজক খবর ময়দানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছড়িয়ে পড়ল। একটা হুটোপুটি লুটোপুটি কাণ্ড! লাট খেয়ে এ পড়ে তো ও পড়ে! আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠরা আমার দিকে রক্তবর্ণে তাকান। আমারই জন্যে তো তাদের আসা। এখন বেঘোরে প্রাণটা বুঝি যায়। কিন্তু তখন রাগ দেখাবার কিংবা ভর্ৎসনার সময় ছিল না। য পলায়তি স জীবতি— এই আপ্তবাক্য শিরোধার্য জ্ঞানে সকলে তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও সভার সভাপতি সোহরাওয়ার্দীর মুহুর্মুহু অনুরোধে লাগামছাড়া পলায়নে জনতার জ্ঞান ফিরে আসে। সবাই শান্ত হয়। আজও আমার কানে বাজে, বাংলা করলে যা দাঁড়ায় : 'এই আপনারা মুসলমান! একটা গুজব ছড়াল আর আপনারা তাই বিশ্বাস করে পালানো শুরু করলেন? এত কংগ্রেসওয়ালাদের আমাদের সভা পণ্ড করার একটা কৌশল। আপনারা বসুন— শান্ত হয়ে লীগের সিদ্ধান্তের কথা শুনুন। আমরা সভা লম্বা করব না। সভা শেষ হলেই যে যার মহল্লায় ফিরে যাবেন।....'

মুহূর্তের মধ্যে সবাই 'খাঁটি মুসলমান' হয়ে গেল। সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পর সভার সমাপ্তি ঘটলে আবার ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি! কে আগে বাড়ি যাবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা। সবার একই ভাবনা— বাড়ির সবাই অক্ষত আছে তো? আবার বাড়ির লোকজনেরও ভাবনা— ময়দানে যারা গেছে তারা ফিরবে তো?

ব্যাপারটা আমাদেরও ভাবিয়ে তুলল। গড়পারে আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় শ্মশ্রু নয়, কেবলই চৈতন্যের লীলা! আমরাও দিশেহারা হয়ে পা চালাই। সভাশেষের পরিণতি দেখে সোহরাওয়ার্দী যথাসম্ভব ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সকলকে লীগের ঈমান, ঐক্য ও শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অকারণ উতলা না হয়ে ধীরেসুস্থে বাড়িমুখো হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু পথ লম্বা— রয়েসয়ে যাওয়ার অবকাশ কোথায়!

গাড়িঘোড়া তো নেই, তাই এবারও হেঁটেই পথ পাড়ি। দৃশ্যটা ভাঙা মেলার। তবে এলে দেয়া নয়, ত্রস্ত পদক্ষেপে বাঁচার আকুতি। পথ ভাঙছি, চাচাজান বলে উঠলেন, 'একবার তোদের বাবার কাছে যেতে হয়— শহরের যা অবস্থা, উনি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। শহরের হালচালের কথাও বলা যাবে ওঁকে।'

আমরা, মানে বড় ভাই ও আমি একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। বৈঠকখানা রোডের মেসবাড়ির লতিফ সাহেবদের দলটা আলাদা হয়ে গেল। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসেছি, মুসলমানদের যা দোষগুণ, কে. সি. দাসের রসগোল্লা সব লুটে নিয়েছে! ভাঙচুরও কম হয়নি। মেঝেয়, সিঁড়িতে, ফুটপাথে রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ, জিলিপি, এম্প্রেস ও জিবে গজার ছড়াছড়ি! মনে পড়ে যায় একবার পুজোয় না বড়দিনের ছুটিতে দেশের বাড়ি গিয়েছি— আমাদের ফণিকাকাবাবু আমাদের ভাইবোনদের জন্যে উপহার পাঠিয়েছিলেন পার্সেলে কে. সি. দাসের টিনের প্যাকেটে রসগোল্লা! সকালে মানিকতলা বাজারের লুণ্ঠিত দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছবিটা আবার সামনে এসে ভেংচি কাটে।

তবে একথা ঠিক, বাজার-ফেরৎ ইন্দ্রলুপ্ত হাসকুটে দাদু যখন পার্সেল খুলে রসগোল্লার টিনের ক্যানটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন— 'এই নাও দাদুভাই, তোমাদের ফণিকাকাবাবু রসগোল্লা পাঠিয়েছেন,' তখন ভাইবোনদের মিলিত আনন্দধ্বনি সুপ্ত গ্রামটাকে সেদিন সচকিত করে তুলেছিল।

ওদিকে ঘর ফেরা কিছু লুটেরা যথাবিধি বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান লুটের উল্লাসে মাতে। নরকে যমরাজেরও অনুচর থাকে, কিন্তু সেদিন কলকাতার পথেঘাটে একটি পুলিশেরও দেখা মেলে নি। সে যাকগে। আমরা যাবো স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, বাবা যেখানে শয্যাগত। কাজেই বাঁয়ে ভিক্টোরিয়া হাউসকে পাশ কাটিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পা রাখি আমরা। কিন্তু ফটিকচাঁদ অ্যাভিনিউ'রও আজ কেমন কুচেল দশা। অমন সুন্দর রাস্তাটা কেমন মড়ার মতো পড়ে আছে। বাড়িগুলোর সদর দরজা মায় জানালার কপাট সব বন্ধ। বেশ কিছু পথ হেঁটে তবে বৌবাজারের মোড়ে আসা গেল। ঐ তো, ঐ যে রাস্তার বাঁয়ে মোড়ের তেতলা বাড়িটা, তিরিশের দশকে ওটার ওপরতলাতেই আমাদের বানভাসি জীবনের তিনটে বছর কাটিয়েছি তো। এতক্ষণ ভালোয় ভালোয় এসেছি, এখানে আসতেই লুটেরাদের হাত যেন আবার উষিপিষি করে ওঠে। যে যা পাচ্ছে হাতিয়ে নিচ্ছে হিন্দুদের দোকান থেকে। আজ আর মনে নেই, তবে এটা মনে আছে আমাদের ঐ এলাকায় ছিল অলঙ্কার ও ফার্নিচারের দোকানসহ বেশ কয়েকটি ঘড়ি এবং টাইপ ও শর্টহ্যান্ড শেখার দোকান। অল্প দূরেই বাইজী পল্লী।

এমন সময় গাড়ির আওয়াজ! পুলিশের ট্রাক। সারাদিনে এই প্রথম গাড়ির দেখা পেলাম। রাস্তা কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে ট্রাকটা ছুটে আসছে লুণ্ঠিত দোকানগুলোর দিকেই। অনেকেই লুটেরাদের সতর্ক করে দিল। কিন্তু মিনি-মাগনা লোভনীয় কিছু পাওয়ার মজাই আলাদা— কাজেই ওরা আজ সবাই বধির।

ট্রাক এসে থামতেই প্রথমে সার্জেন্ট তারপর লাল পাগড়িওয়ালা কনেস্টবলেরা ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে ব্যাটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ্যাঁচড়দের ওপর। এবার বধিরতা ওদের দূর হয়, কয়েক ঘা পড়তেই পালাবার পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করল কি? মনে পড়ে না।

আবার পথ চলা। সারাদিন এই যে এত হাঁটছি— কই, ক্লান্তি কোথায়। একবার ভাবুন তো, গড়পার থেকে বৈঠকখানা, সেখান থেকে আপার সার্কুলার রোড— মৌলালি'-ধর্মতলা হয়ে গড়ের মাঠ, তারপর ময়দান থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের দোরগোড়ায়! তারপরে ক্লান্তি নেই অষ্টম শ্রেণিতে পড়া খোকাবাবুর! পেটা লোহার সুন্দর কাজ করা ফটক পেরিয়ে ট্রপিক্যাল স্কুলের সবুজ আঙিনায় ঢুকলাম। কিন্তু বাবা তখন অদূরে কলেজ স্ট্রিটের ধারে যে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হাসপাতাল,[৪] সেখানে শয্যাগত। ডিউওডিনাল আলসারের কারণে অস্ত্রচিকিৎসার অপেক্ষায়। খুবই শক্ত ব্যামো— ক্ষুদ্রান্তের ঘা। দোতলায় জানালার পাশে বাবা উঁচু করা বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে চোখ বড় বড় করা দুর্বল দেহটাকে টেনে এনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর—

— এ কি তোমরা! এই খুনোখুনির মাঝে!

— কি আর করব, মিজানের এক গোঁ— গড়ের মাঠে যাবেই। তাইতো ওখান হয়ে আপনার কাছে আসা।' আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন চাচাজান। কিন্তু বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন— খোকনের জন্যে!' ঐ দুর্বল শরীরেও বাবার কণ্ঠের কি তেজ। তারপর যোগ করলেন— জানো, আজ ফজরের নামাযের সময় ওধারের ঐ মসজিদে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে? নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিদের কি ভাবে যে কচুকাটা করেছে, তা যদি দেখতে, ওদের প্রাণে বাঁচার আকুতি যদি শুনতে।[৫] এই জানালা দিয়ে সব দেখে বাড়ির কথা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে আছি— না জানি তোমার ভাবি ও ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে কি জুটেছে। আর তোমরা কিনা এখানে!' এরপর আমাকে অর্থাৎ তাঁর আদুরে খোকনকে আচ্ছা করে ডেঁটে দিয়ে পুনরায় বললেন— তোমরা আর মুহূর্ত দেরি করো না। আর একটা কথা বাদশা,[৬] যদি দেখিস তেমন খবর— বাবার গলা ধরে আসে, চোখ সজল। চাচাজান অলুক্ষণে কথাটার সুযোগ না দিয়ে বাবার একটা হাত মুঠোয় পুরে বলেন— ওসব ভাববেন না তো, আল্লাহর ফজলে দেখবে, সবাই ভালো আছে। আমরা তাহলে চলি, আর দেরি করা ভালো নয়।

আমরা ওয়ার্ড থেকে বেরুবো, দেখি বাবা তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে— ওঁর চোখেমুখে যেন সব হারানোর উৎকণ্ঠা। তখন সন্ধ্যে ছ'টা সাড়ে ছ'টা হবে। মেঘলা আকাশ সন্ধ্যা নামিয়েছে আগেভাগেই।

একটা সরু এক চিলতে পথ ধরে কিছুদূর এগোতেই মেডিক্যাল কলেজের মস্ত আঙিনায় এসে পড়লুম। চারদিকে লোক গিস্‌গিস্ করছে। জানা গেল আশেপাশের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার গৃহহারা লোক এরা একটু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। আমরা এগিয়ে গেলাম কলেজ স্ট্রিটের প্রধান গেটের দিকে। গেট বন্ধ। দারোয়ান এগিয়ে এসে বলল— বাহার মাত যাইয়ে বাবুজি, জান কুরবান হো যায়েগা।

কিন্তু আমাদের যাবার তাড়া ছিল, নতুবা বাবা ভারি রাগ করবেন আর ঐ সঙ্গে মা ভাইবোনেরা কেমন আছে সে ব্যাপারটাও ছিল। অথচ দারোয়ানের কথাটাও হেলা করার মতো নয়। কলেজ স্ট্রিটকে মনে হচ্ছিল অমাবস্যার নীমতলা— ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো যেনবা গাবুরে গেঁজেল সন্ন্যাসীদের কল্কের আগুনের মতো মিট মিট করে জ্বলছিল। সারিবদ্ধ দোকানগুলো হাত পা গুটিয়ে তরাসে কাঁপছে যেন। গোলদিঘির দিকে তাকিয়ে দেখি আলো-আঁধারির মৌনী খেলা। লোকজন নেই, যানবাহন নেই। দিঘির কালো জলে মাছেরা ঘাই মারতেও বোধ করি ভুলে গেছে। এমন সময়—

'মুঝে ছোড়োদো, হামকো যানে দো।'

দারোয়ানের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে একটা দশ-বারো বছরের ছেলের কাকুতি-মিনতি কানে এলো। দারোয়ান যত ছেলেটিকে বোঝায় রাস্তায় নামলেই মারা পড়বে, ছেলেটি ততই ছাড়া পাবার জন্যে জোরজবর করে আর বলে সে পাটোয়ার বাগানে তার মায়ের কাছে যাবে। না গেলে তার আম্মিজান তাকে ভারি ডাঁটবে। উপস্থিত আরো অনেকেই বোঝাল তাকে এবং কিছুক্ষণ আগে একজনকে ঘায়েল হতেও দেখেছে এমন একটা ভয়ঙ্কর তথ্যও যখন বিফলে গেল, নিরুপায় দারোয়ান গেটের

শেকল খুলে দিলে। মুক্তিপাগল ছেলেটি বাইরে বেরিয়েই দ্রুত পা চালায় গোলদিঘি লক্ষ করে— উদ্দেশ্য, মির্জাপুর ভেঙে বৈঠকখানা যাবে। ছেলেটির সৌভাগ্যে আমারও মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমরাও তো যেতে পারি, কিন্তু ততক্ষণে গেট বন্ধ করে দিয়েছে দারোয়ারন। দম আটকানো ঐ নির্জন রাস্তায় ছেলেটির পায়ের আওয়াজ কি এত্তেলা পাঠালে বলতে পারব না, হরলালকা-র পাশের গলি থেকে ভোজালি হাতে গায়ে ধুতিপরা এক গুঁফো লোক এক লহমায় রাস্তা পার হয়ে ছেলেটির ওপর হামলে পড়ল। 'আম্মা' 'আম্মা' বারকয়েক বলতে পারল শুধু, তারপরই ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই গুঁফো লোকটা ভোজবাজির মতোই এক লহমায় উবে গেল হরলালকা-র গলিতে। আমরা সবাই নিথর। দারোয়ান আমার দিকে তাকিয়ে গজগজ করে উঠল, 'এ খোকা, আওর সাবুত চাহিয়ে? জান দিয়া, লেকিন মেরা বাত নাহি শুনা।'[৭]

হাসপাতালের লোক ছুটে যায়। ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসে, ছেলেটার পেট এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে সে এক বীভৎস দৃশ্য! গলগল ক'রে রক্ত ঝরছে, শার্টের রঙটাই বদলে গেছে!

ওর মায়ের কি হবে? ছেলেটা বাঁচবে তো? আউটডোর এমার্জেন্সির করিডোরের আড়ালে চলে যেতেই মনপ্রাণ আমার হুহু করে উঠল। মা! মাগো!

'একিরে তোরা এখানে? ছোটমামা আপনি?' খাকি হাফপ্যান্ট ও শার্ট গায়ে ফিরোজ ভাইজান!

চাচা সব খুলে বললেন এবং অসহায়ভাবে যোগ করলেন, 'সব তো শুনলি। এখন দেখ, যাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস কিনা।'

মাথা নেড়ে ফিরোজ ভাই বললেন, 'আমি নিজেই তো আটকা পড়ে গেছি, টালিগঞ্জ যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ওখানকার খবর কিছুই জানতে পারি নি।'[৮]

'তোর কথা রাখ তো। টালিগঞ্জে তো আর তোর আপন কেউ নেই যে ভাববে। তোর ছোট মামির জন্যে কোনো চিন্তা নেই, পাটোয়ার বাগানে মুসলমান পাড়াতেই তো আছে। কিন্তু এবার ভেবে দেখ তো তোর বড় মামির কথা। আমার তো ভাবি আর ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।' চাচাজানকে খুব অসহায় মনে হলো।

'আমার হাতে যা খবর আছে তাতে কলকাতার কোনো অঞ্চলই দাঙ্গার বাইরে নয়। গড়পার তো দূরের কথা, পাটোয়ার বাগানই বা যেতে পারছেন কই। বড় মামিদের নিয়ে ভাবনার কথা বটে। একটা খবর নেয়া যায় কিনা ওদিকের লোক পেলে চেষ্টা তো অবশ্যি করব।'

'তাহলে?' ফিরোজ ভাইয়ের কথার জবাবে চাচাজান এটুকুই বলতে পারলেন।

'এখন আপাতত চলুন রোজা ভাঙবেন। তার আগে একটা খবর দিয়ে আসি বড়-মামাকে। আপনারা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন।' বলেই ফিরোজ ভাই পা বাড়ান।

রমজান মাস মনেই ছিল না। আমরা ছোটরা রোজা তো রাখতুম না, তবে ইফতারির মজাটাই ছিল আলাদা, ঘুমকাতুরে চোখে রাত দুপুরে সেহ্‌রি খাওয়ার রোমাঞ্চ আজও যেন অনুভব করি।

অচিরেই ফিরোজ ভাই এসে হাজির। বাবা খুবই চিন্তিত একথা জানিয়ে এগোতে থাকেন। আমিও এগোতে যাব হঠাৎ হাসপাতালে মস্ত লোহার গেট পেরিয়ে একটা লরি ঢুকল। একতলা আউটডোর ভবনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লরির লোকেরা চারপাশের আবরণগুলো নাবিয়ে দিলে। কি ভীষণ! কী ভয়ানক! কি বীভৎস!

এলোমেলোভাবে একে অপরের গায়ে ওপরে নিচে ক্ষতবিক্ষত রক্তে নাওয়া লাশ আর লাশ আর লাশ! দাঙ্গার বিষাক্ত প্রভাবে বালকের অনুসন্ধানী সাম্প্রদায়িক চোখ লক্ষ করে শবের ভিড়ে লুঙ্গি-পাজামার সংখ্যার আধিক্য। কারও পা নেই, কারো হাত নেই, কারো পেট কাটা, কারো গলা, আর আমার চোখের সামনে যে দেহটি— তার নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে ঝুলছে একপাশে আর পুরো মুখটাই থেঁতলানো একটা গর্ত— তখনও ঐ গর্ত বেয়ে টস টস করে গলে পড়ছে রক্ত আর নাড়িগুলো থিরথির করে কাঁপছে আর থেকে থেকে খিঁচুনি! তার মানে পুরোপুরি নিস্পন্দ হয়নি, 'প্রাণ' তখনও আছে!

'ও কি দাঁড়িয়ে কেন, চলে আয়।' বড় ভাইয়ের তাড়া। ঐ হতভাগ্য লোকটার যদি প্রাণ থেকেও থাকে— এতগুলো লাশের মধ্যে খুঁজে পাবে তো তাকে এমারজেন্সির লোকেরা? নাকি চলে যাবে মর্গের স্বর্গে?

পা চালিয়ে আমাদের দলের কাছে চলে আসি। যেদিকে তাকাই লোকে লোকারণ্য। সবাই উদভ্রান্ত, বিষণ্ন, আমাদের মতোই। মনে হচ্ছিল আমরা যেন সবাই লাশ, কারণ শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু নিরাপদ গোরের খোঁজে!

যতদূর মনে পড়ে আমরা ট্রপিক্যাল স্কুলের ল্যাবরেটরির পাশে যে একটি ঘর ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হলো ওটা হাসপাতালের ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত একটা ঘর। আগে থেকেই অচেনা কিছু লোকও ছিল। যারা রোজা রেখেছে এবং রাখে নি, বলা চলে আমরা সবাই ক্ষুধার্ত ছিলাম, সারাদিন ঘোরাঘুরির ধকল তো কম যায় নি। সামনেই ঘরের মাঝে সাজানো রয়েছে সুস্বাদু ইফতারির খাবার। হাসপাতালের কিছু মুসলমান কর্মী এমন দুর্যোগের মাঝেও কি করে এই আয়োজন করল তা ভেবে অবাক হই। ধর্মতলায় লুট হয়ে যাওয়া রাস্তায় পড়ে থাকা বইয়ের স্তূপ থেকে যে পছন্দসই বইটা সংগ্রহ করেছিলাম, ওটা যখের ধনের মতো আগলে বেড়িয়েছি এতক্ষণ।[৯] বইটা একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে সকলের সঙ্গে আমিও হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। সবাই গোল হয়ে বসেছেন, আমিও একটু জায়গা করে নিলাম। সবাই প্রতীক্ষা করছেন আজানের। সময় বয়ে যায়, কিন্তু কোনো মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসে না আজানের ধ্বনি। হঠাৎ খেয়াল হলো মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া মসজিদটির লাঞ্ছিত হওয়ার এবং নামাজীদের নিহত হওয়ার কথা। কাজেই ঘড়ি দেখে একটু দেরিতে হলেও সবাই পানি খেয়ে রোজা ভাঙেন। এরপরই পেঁয়াজু-ছোলা-শসার কুচি দিয়ে বানানো মুড়ি। সবার কথা বলতে পারব না, আমার কাছে অমৃতই মনে হয়েছিল। সবশেষে একটু চা-ও হলো— তবে দুধের অভাবে লিকার চা— আজও আমার মনে হয় সেদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পানীয়ই পান করেছিলাম আমি।

তখনও জানতুম না, ওটাই আমাদের রাতের খাবার হয়ে গেল। এবার প্রশ্ন উঠল রাতটা কাটানো যায় কোথায়। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে আশ্রয় নেয়া অন্যান্য সবাই যে

যেখানে পারছে, তা সে বারান্দা হোক কি গাড়িবারান্দা, গাছের তলায় কি উদোম আকাশের নিচের সবুজ ঘাসের বিছানায়, ঘুম আসবে ছাই, তবু একটু কাৎ হয়ে নিচ্ছে।

আমাদের ঠিক হলো বাবাদের আপিস ভবনের দোতলায়।

এমন সময় অসুস্থ দেহে ঢিকনো চালে বাবা এলেন। সব শুনে সায় দিলেন, 'সুরুজবালি[১০] তো তোদের জানেই। সেরকম হলে আমার কথা বলিস, দোতলায় ওঠার চাবি দিয়ে দেবে।' এরপর গড়পারে মায়েরা কিভাবে আছেন কেমন আছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বাবাকে কোনো কঠিন মুহূর্তেও কাঁদতে দেখি নি। কিন্তু যখন তিনি ফিরে গেলেন তাঁর প্রিন্স অফ ওয়েলস হাসপাতালের আরোগ্য নিকেতনে, তখন তাঁর গমনোদ্যত ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন একটা কান্না যেন উথলে উঠতে দেখলাম।

ট্রপিক্যাল স্কুল ভবনে এসে সুরুজবালির কাছে সব খুলে বলতে সে দ্বিরুক্ত না করে দোতলায় ওঠার গেটের চাবিটা চাচাজানের হাতে দিয়ে দিল। তবে এই কড়ারে যে সকাল হওয়া মাত্রই যেন আমরা কর্মকর্তারা কেউ টের পাওয়ার আগেই নিচে নেমে পড়ি। না হলে তার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। অম্লানবদনে তা মেনে নিয়ে চাচাজান তালা খুলে আমাদের ছোট দলটিকে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। সুরুজবালি চাবি নিয়ে ডিউটিতে চলে গেল।

লম্বাচওড়া টানা বারান্দায় ছিল কয়েকটা বড়সড় টেবিল। টেবিলগুলো কেন বারান্দায় চেয়ার বিনে উদোম গায়ে পড়ে আছে, সে গবেষণায় না গিয়ে আপাতত আমরা খুশি এ কারণে যে, শোয়ার একটা যো-সো হিল্লে তো হয়ে গেল— নতুবা মেঝেয় গড়াগড়ি দেয়া ছিল নিয়তি। কিন্তু বেচারা মন্টু ও লতিফভাই খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। ওঁদের আফসোস, সুরুজভাইদের সঙ্গে মেসে ফিরে গেলেই ভালো করতেন তাঁরা। এখন এখানে বেঘোরে প্রাণটা বুঝি যায়। ওদের চোখে খোট্টা সুরুজবালি বলিষ্ঠকায় যমদূত বই আর কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা লোকটা হিন্দু। কাজেই রাতে পাল্টাপাল্টি পাহারা দিয়ে ঘুমাতে হবে সবাইকে। রক্ষক ভক্ষক বলে কথা।

মন্টু-লতিফ ভাইদের কথার গুণে আশঙ্কটা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো— পরিচিত সুরুজবালিকেও অপরিচিতি মনে হলো আমাদের।

সবাই শুয়ে পড়লেও ঘুম আসছিল না কারো। ঘুরে ঘুরে দাঙ্গাহাঙ্গামার কথাই উঠছিল। চাচাজান একসময় একটু যেন আশঙ্কা ও অপরাধীর সুরেই বললেন, 'মিজানদের বাড়ির অবস্থা কি, কে বলবে। এখন আফসোস হয় কেন লোকটার কথা শুনলাম না।'

'আপনি কার কথা বলছেন?' প্রায় একসঙ্গে লতিফ ও মন্টু ভাই বলে উঠলেন।

'আজ সকালে যখন গড়পার থেকে মিজানদের নিয়ে ফিরছি, কেশব সেন স্ট্রিটের মোড়ে এক কলকাতিয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন আমরা হিন্দুপাড়া থেকে এলাম কেন। সব খুলে বলতে উনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন, আপনি তো আজব আদমি সাহেব! ওদের (অর্থাৎ মা ও ভাইবোনদের) হিন্দু মহল্লায় রেখে আপনারা চইলে আসলেন! আমি বলে রাখছি, খোদা কি কসম, সময় থাকলে নিয়ে আসুন, নাহি তো

উনলোগো কি কিসমত মে বহুত খারাবি আছে।' কিন্তু তখনও এমন মারাত্মক কিছু ঘটে নি— তাই ওর কথায় কান দিই নি। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম....।

এমনি অনুশোচনা ও টুকিটাকি কথা। কেউ কেউ এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমারও চোখ জড়িয়ে আসছিল। এমন সময় সাইরেনের মতোই কাছে দূরে মহা বিপদসঙ্কেতের মতোই রণিত হতে থাকল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি[১১]। আমরা সবাই কেঁপে কেঁপে উঠলাম। মন্টু ভাই ছিলেন ভারি ডরকো, বারান্দার অল্প আলোতেও ওঁর বলির পাঁঠার মতো কাঁপুনী আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এমন সময় ফিয়ার্স লেন কলুটোলা এবং দূরদূরান্ত থেকে 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। একটু বা আশ্বস্ত হলাম, না, আছে তো স্বগোত্রের লোকেরা। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার কাছে এই 'আল্লাহু-আকবর' পুরো সোয়াস্তি এনে দিল না। বন্দে মাতরম্-এর মতোই এর গায়ে যেন তাজা রক্তের দাগ। কারণ দুটো শব্দের ঝংকারের মধ্যেই কমবেশি কেঁপে উঠছিলাম।

এভাবে পাল্টাপাল্টি হিন্দু পল্লী ও মুসলমান পল্লীর আকাশ বাতাস যুগপৎ বন্দে মাতরম্ ও আল্লাহু-আকবর ধ্বনিত হওয়ার কারণে ভারী হয়ে উঠেছিল সেদিন এবং আতঙ্কিত কলকাতাবাসীর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সেকালের সবার নিশ্চয়ই মনে পড়বে নেতাজী সুভাষের আবির্ভাব নিয়ে ভগ্নদূতের কত-না কেচ্ছাকাহিনীর কথা। হয়তো একদিন থাকবে 'আজ বিকেল ৪ টেয় কলেজ স্ট্রিটে ট্রামে নেতাজীকে দেখা গেছে', আরেকদিন 'এলগিন রোডে ছদ্মবেশী সুভাষ' ইত্যাদি। প্রথম প্রথম খুব কাটত কাগজ। পরে সহজে চিড়ে না ভিজলেও ভগ্নদূত কখনও ভেঙে পড়ে নি। ওদিকে দেশভাগের পর ভোল পাল্টে অ্যাডভান্স 'সিনে অ্যাডভান্স'-এ দাঁড়ায়।

২. আমার 'গৃহযুদ্ধে আমি যাহা দেখিলাম' স্মৃতিচারণার পাতা থেকে। গৌরকান্তি শিক্ষিত ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল সেদিন— কারণ, ওর চেহারায় ছিল ঠাকুরদার সনাতন মায়াময় দ্যুতি। এ প্রসঙ্গে আরেক বৃদ্ধের কথা বলতে হয়। "ভানু-জগা নামে দুই গুণ্ডা এক মুসলমানকে মেরে তার ছিন্নমুণ্ড সোল্লাসে লোককে দেখিয়ে বেড়ায়। 'যবন' হত্যা করেছে বলে তাকে আশীর্বাদ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।" (সূত্র : 'উৎস মানুষ', জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ১১। উদ্ধৃতি— 'উত্তাল চল্লিশ', পৃ. ১৯১)।

৩. মওলানা আলী-র সন্ধিসমৃদ্ধ বিকৃত বানান ও উচ্চারণ। এই দরগায় মুসলমানদের চেয়ে বরং হিন্দু ভক্তরাই যেন শিন্নি মানত করে বেশি— এ আমার নিজের চোখে দেখা। অথচ কি নিদারুণ পরিহাস— সব ভুলে এরাই আবার মওলা বাবার কাছে অস্ত্র মানত করতে পেছপা হয় না মোটে— কারও আর্জি খোদার কাছে, কারও আর্জি ঈশ্বর সমীপে!

৪. মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে আরো চারটে প্রতিষ্ঠান সেই ব্রিটিশরাজ থেকেই বহাল আছে— ক. স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন (বাবা এখানেই কর্মরত ছিলেন), খ. কারমাইকেল হসপিট্যাল ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিন, গ. ইডেন আইন হসপিট্যাল, ঘ. প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স হসপিট্যাল (অস্ত্রপ্রয়োগের হাসপাতাল, আমার ডায়েরির ভাষায় 'কাটাছেঁড়ার হাসপাতাল')। পুরো হাসপাতাল প্রাঙ্গণই ছিল ছবির মতো। বৃক্ষ ও সবুজ ঘাসে মোড়া স্বর্গোদ্যানের ফাঁকে ফাঁকে রেসিডেন্ট ডাক্তাদের কোয়ার্টারগুলো আমার মনবেদিকায় আজও কি সতেজ। এমনই একটা কোয়ার্টারে ছিলেন আমাদের ডা. শাহজাহান দাদু— বাবার সেজ মামা।

৫. ফজরের নামাজ, তার মানে ঊষা কাল, ঘড়ি ধরলে সাড়ে চার কি পাঁচটা বাজে তখন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ভোর পাঁচটার মধ্যেই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটেছিল। এবং এ সম্পর্কে 'উৎস মানুষ'-এর জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা' নিবন্ধে দাঙ্গার প্রথম বলি-র সময় নিয়ে মর্ডান রিভিউর বরাত দিয়ে যা বলেন তা তো আর মেনে নেয়া যায় না। সন্দীপ বাবু লিখছেন :

"তবে ১৬ আগস্টের সকালে কোনো গোলমাল ছিল না, বা ওই দিন হিন্দুরা পাল্টা আক্রমণ করে নি— এ কথা ঠিক নয়। হাসাপাতাল রেকর্ড থেকে জানা যায়, মেডিক্যাল কলেজে প্রথম আহত ভর্তি হয় সকাল ৭-১৫য়, এক মুসলমান কাঠের মিস্ত্রি ; তিনি ছুরিকাহত হন কেশবচন্দ্র নে স্ট্রিটে। দ্বিতীয় ভর্তি সকাল৭-৩৫ এ, এক হিন্দু। ক্যামবেল (নীলরতন সরকার) হাসপাতালে প্রথম ভর্তি হিন্দু— সকাল ৯টা। কারমাইকেল (আর জি কর) হাসপাতালে প্রথম আহত ভর্তি হয় সকাল ৭.৪৫ এ; হিন্দু। [ম. রি., সেপ্টেম্বর ১৯৪৬] "দেখা যাচ্ছে, দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল সকাল থেকেই; তবে তা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত উত্তর এবং মধ্য কলকাতায়। আহতদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিল। প্রথম দিনের (১৬.৮.১৯৪৬) খতিয়ান [মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬] :

হাসপাতাল	ভর্তির সংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
মেডিক্যাল কলেজ	৪৩৫	১৭৬	২০৭
ক্যাম্‌বেল	১৩২	৬৭	[+অন্যান্য ৫২]
কারমাইকেল (দুপুর ১২টা পর্যন্ত	১৬	১১	৫
মোট	৫৮৩	২৫৪	২৭৭ [+ অন্যান্য ৫২]

"অসম্পূর্ণ এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে— প্রথম দিনেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রথমেত মুসলমানের পক্ষ থেকে একতরফা 'নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু এবং অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে'— প্রবাসী-র এই মন্তব্য (আশ্বিন ১৩৫৩) ঠিক নয়। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ প্রথম দিন থেকেই ছিল।"

** কিন্তু বাবার চাক্ষুষ তথ্য অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া কলেজ স্ট্রিট ঘেঁষে যে ছোটখাটো নিরাভরণ মসজিদে অতগুলো লোক হতাহত হলো, ওদের হিসেব ওপরের খতিয়ানে নেই দেখে অবাক হচ্ছি, আর সকাল ৭-১৫ নয়, ভোর ৫টাতেই যা ঘটার ঘটে গেছে, আর তা হিন্দুদের হাতেই। উপরন্তু মেডিক্যাল কলেজের নাকের ডগায়!

৬. ট্রপিক্যাল স্কুলের ল্যাবরেটরিতে কর্মরত চাচার ডাকনাম।

৭. আমাদের ফুফাতো ভাই। চাচার মতো তিনিও ছিলেন ট্রপিক্যাল স্কুলের ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট। আগে আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। চাকরি হয়ে গেলে আলাদা স্বাধীন জীবন শুরু করেন টালিগঞ্জের এক মেসবাড়িতে।

৮. "উত্তর আর মধ্য কলকাতায় যখন আগুন জ্বলছে, দক্ষিণ কলকাতা তখনো তুলনায় শান্ত। টালিগঞ্জ পাড়ায় বিকেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল লক্ষ করেছিলেন— 'ক্রমাগত গুজব রটছে। চারিদিক দারুণ উত্তেজনা।' " (*অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ১৬)।

৯. আমিও লুটেরা হয়ে গেলাম কিনা জানিনে, তবে হতমূর্খের হাতে হতমান জ্ঞানভাণ্ডার থেকে একটি বই মালিকের অগোচরে সংগ্রহ করাটাকে সেদিন ঐ উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অন্যায় বলে মনে হয় নি আমার। অন্য যেকোনো জিনিস, তা সে সামান্য পেপারওয়েট কি পেপার-কাটার হোক, না বলে নিলে সেটা চুরি বলে গণ্য করি আমরা, কিন্তু একটি বই তার ক্রয়মূল্য যাই হোক না কেন, অনায়াসে না বলে বয়ে নিয়ে যাই নিজের ডেরায়— এবং আশ্চর্য কখনও কিন্তু মনে হয় না ওটা চুরি হলো। এর পেছনে কি মনস্তত্ত্ব কাজ করছে জানি নে, তবে জ্ঞানের ভাণ্ডারের একক মালিকানা

যে কারও বরদাস্ত হয় না, একথা বলা যায় অনায়াসে। মার্ক টোয়াইনের ক্ষেত্রে আবার তা একশ ভাগ সত্য।

১০. স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসেনের হিন্দুস্তানী দারোয়ান। বাবার খুব নেওটা ছিল। ঐ আমাদের ডেরা যখন বৌবাজার, তখন মায়ের অনেক আবদার এই সুরুজবালিই মেটাত। বাজার ও অন্যান্য ফুটফরমাস এবং গঙ্গার ঘাট বিশেষে স্বাদ বিবেচনায় এনে ইলিশ জোগাড় করে দেয়া— এসব সে সানন্দে পালন করত। বিনিময়ে মায়ের অর্থ ভাঁড়ার ঐ চঞ্চল আঁচলের বাঁধন শিথিল হতো বৈকি।

১১. 'বন্দে মাতরম্'— এই নিরীহ শব্দ দুটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত হওয়ার ফলে মুসলমান সমাজে পরিত্যজ্য হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। মাতৃভূমির বন্দনা, এর মতো পবিত্র ভজনা আর কি হতে পারে। একবার বঙ্কিম বাবুর ছাব্বিশ পঙ্‌ক্তি সংবলিত গানটির প্রথম সাত পঙ্‌ক্তি গান তো :

'বন্দে মাতর্‌ম।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনিম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥'

আহা! মরি মরি! মায়ের কি রূপ! কিন্তু এই সুজলা-সুফলা-মলয়শীতলা-শস্যশ্যামলা-জ্যোৎস্না-পুলকিতা-ফুল্লকুসুমিতা সুহাসিনী মা কেবলই সনাতনীদের দশপ্রহরণধারিণী মা, ম্লেচ্ছ মুসলমানের নন, তবে যবন হলেও ইংরেজের মা, কারণ ইংরেজ রাজা হয়ে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারে এগিয়ে এসেছিল! উচ্চস্বরে 'বন্দে মাতরম্' হেঁকে তাই হিন্দু সন্তানদের দল যেখানে মুসলমান পায় হত্যা করে, মৃতদেহেরে মুখে পদাঘাত করে, তাহাদের ঘরে আগুন দিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, বলে 'বন্দে মাতরম্' বল, নহিলে মারিয়া ফেলিব, এবং অনেক যবন নিহত হলে অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলে গায়ে মাটি মেখে হরিনাম করতে আরম্ভ করে এবং জিজ্ঞেস করলে তার মুখ দিয়ে বলায়, 'মুই হেঁদু'।

কাজেই, 'বন্দে মাতরম্' শব্দটার মাহাত্ম্য যাই থাক, এর শব্দটা ধ্বনিত হলেই বুকটা ধক্ করে উঠত।

সম্প্রতি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিখ্যাত দক্ষিণী সুরকার ও গায়ক এ. আর. রহমানের অপূর্ব কণ্ঠে গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' মা তুঝে সালাম' গানটি এই শব্দদুটির অর্থের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই গানটির সুর ও বাণীর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক দীপ্তি মনেপ্রাণে সুধা ঢালে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আতঙ্কের সাগরে ভাসতে ভাসতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। চোখ মেলতে তাকিয়ে দেখি সকাল হয়ে গেছে। লম্বা টেবিলগুলো সব শূন্য— সবাই উঠে পড়েছেন। কেবল আমিই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলাম। চেত্তা ভেঙে উঠে পড়তেই লতিফ ভাই তাড়া দিলেন তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে। কারণ সুরুজবালিকে কথা দেয়া হয়েছে কর্মকর্তারা টের পাওয়ার আগেই আমাদের দোতলা ত্যাগ করতে হবে। কাজেই বাথরুমের কাজ সেরে নিচে নেমে এলাম সবাই। সেন্ট্রাল এভিনিউর দিকে তাকিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই, সব কোলাহল কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেছে! অনন্তকাল যেন এমনটাই ছিল সব। হঠাৎ পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল আর মাথাটাও ঝিম ঝিম আর কেমন ঘোলাটে ঠেকল। দুদিন ধরে ঐ ইফতারির মুড়ি আর চা ছাড়া পেটে কিছু পড়ে নি— ক্ষিদেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু খাবার নাস্তি। হঠাৎ মায়ের কথা মনে হলো। ফিরপোর সেঁক দেয়া পাঁউরুটির গায়ে আলতো করে মাখন লাগিয়ে তার ওপর একটু চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে হাতে ধরিয়ে দিতেন, আমরা তাই চায়ে ডুবিয়ে চারিয়ে চারিয়ে খেতুম। আবার কোয়ার্টার বয়েল্ড ডিমে গোলমরিচ ছড়িয়েও খাওয়া হতো। মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের ঢাকাইয়া দোকান থেকে গরম গরম ডালপুরি কি আলুপুরি কিংবা সমুচা সহযোগেও জলযোগ হতো বৈকি। আর শীতের ভোরে নাহারি আর তন্দুরের কথা মনে পড়তেই জিভে জল এসে যায়।

'ওদিকে নয়, এদিকে। তোর কি হলো বল তো? বাড়ি যেতে হবে না?' বড় ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে নাস্তার সুস্বাদু স্বপ্নটা ভেঙে যায়। বোধকরি ভাইজানেরও মনে পড়ে থাকবে মায়ের হাতের অবাক করা জলপানের কথা।

চারদিকে এত লোক, অথচ কোনো কলরব নেই। বিষণ্ন উদ্‌ভ্রান্ত সবাই। রাতে আরো অনেকেই এসেছেন প্রাণের দায়ে। ভিড় ঠেলে ঠেলে আমরা অবশেষে মেডিক্যাল কলেজের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছুলাম। কলেজ স্ট্রিটের পেটা লোহার গেট দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আসছে লরির পর লরি, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি, প্রাইভেট কার, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি— সবটাতেই ঠাসাঠাসি হত-আহত মানুষ। আউটডোরের সামনে এসে দাঁড়াতেই হাসপাতালের লোকেরা স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ভেতরে। গতকাল যা দেখেছি তার চেয়ে সংখ্যার দিক থেকে এবং বীভৎসতার বিচারে সব মাত্রাই যেন ছাড়িয়ে গেছে আজ। বিরামহীন গাড়ির মিছিল, নিথর লাশ আর আহত মানুষের আর্ত চিৎকারে ও গোঙানিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক চোখটা আমার লক্ষ করে লুঙ্গি-ধুতির সহাবস্থান। আজ যেন সমানে সমান। পোর্টিকো, করিডোর রক্তে

মাখামাখি— শুকোতে পারছে না, সাজো রক্তের ফোঁটা স্থান করে নিচ্ছে পরক্ষণে। দেখতে দেখতে একসময় আমার অনুভূতি গেল ভোঁতা হয়ে। সরে এলাম। অদূরে আমাদের দলের অভিভাবক হিসেবে চাচা একজন লোকের সঙ্গে বাড়ি যাওয়া যায় কি করে তাই নিয়ে আলাপ করছিলেন। বাকি সবাই এক জায়গায় বসে আছেন গোল হয়ে। এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো শরণার্থীদের দল কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে কথা কইছে। অনেকেই ভিড় জমিয়েছে বন্দ গেটের কাছে। জনশূন্য কলেজ স্ট্রিট মড়ার মতো পড়ে আছে— মাঝে মধ্যে মিলিটারির ট্রাক পাড়া কাঁপিয়ে ছোটাছুটি করছিল এবং প্রাইভেট কার ও অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলো ঢুকে পড়ছিল হাসপাতালে— হতাহতদের কিংবা বিপন্ন মানুষদের পৌঁছে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল পরক্ষণে। এমন সময় চাচা গম্ভীরমুখে এগিয়ে এসে জানালেন, 'দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরেই। হিন্দু পাড়া ভেঙে কোনোমতেই বাড়ি যাওয়া যাবে না। চলো আমাদের ট্রপিক্যালেই ফিরে যাই।'

আমরা আবার ট্রপিক্যালের এলাকায় ফিরে এলাম। দেখা হয়ে গেল সাবেকের সঙ্গে। আমাদের গাঁয়েরই ছেলে। বাড়ির কাজের লোক হিসেবে আনা হয়েছিল। সময় ও সুযোগ বুঝে ট্রপিক্যালে পিয়নের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। গাঁয়ের এমনি আরো অনেক গরিবের ঘরের ছেলেকেই বাবা চাকরি দিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের দুর্গতির কথা শুনে সাবেক আফসোসের সুরে বলল, 'আমাদের আগে বলেন নি কেন— তাহলে তো আর এত কষ্ট করতে হতো না। আপনারা তো জানেনই আমি ছাড়া খবির আর ওর দু'ভাই দলিল ও জলিল এখানেই থাকি। আর দেরি নয়, চলুন তো আমার সঙ্গে।

এই বলে সাবেক আমাদের ইডেন আই হসপিটালের দিকে নিয়ে চলল। আমরাও টু শব্দটি না করে ওর পিছু পিছু চললাম। এই হাসপাতালের একতলায় ছিল চাচাজান ও ফিরোজ ভাইয়ের ল্যাবরেটরি আর তার পাশেই ছোট একটা অফিস ঘর। এখানে আমাদের বসিয়ে রেখে 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে সে বেরিয়ে গেল। তখন দশটা কি এগারোটা বাজে। কিছুক্ষণ পরে কোঁচড়ে করে চাল নিয়ে হাজির হলো সাবেক। 'যা পাওয়া গেছে তাতে এ বেলাটা চলে যাবে আপনাদের,' বলেই সাবেক চাল ধুয়ে হাঁড়িতে চাপিয়ে ইলেকট্রিক চুলোয় রান্না চড়িয়ে দিল। আমরা নীরবে সব দেখি— সাবেকের পেশীবহুল হাতের ওঠানামা ওর কপালের কুঞ্চিত বলিরেখা এবং 'ঐ যা : ভুল হয়ে গেছে' বলে ওর ত্বরিত চলে যাওয়া। আমরা পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করতে পারি মাত্র। এবং যখন কোঁচড়ে কিছু ডাল নিয়ে এসে সাবেক আবার বিজয়ীর বেশে উদয় হয়, তখন ওকে দেবতা ছাড়া আর কি ভাবতে পারি আমরা।

ভাতের জল সবে টগবগ করে ফোটা শুরু করেছে, এমন সময় দলিল ও জলিল এসে উপস্থিত। সব জেনে দু'ভাইয়ের কি না উষিপিষি দশা, আশু কিছু কারা নেই জেনেও। আমাদের দু'ভাইয়ের মলিন চেহারা দেখে ফিরোজ ভাই ও চাচাজান আমাদের বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বাবার লকারের ওপর সদ্য রেখে যাওয়া হাসপাতালের খাবারের ট্রে শোভা পাচ্ছে। আমাদের সতৃষ্ণ চোখ সেদিকে ধায়। বাবা সামান্যই খেলেন। বাকিটা দু'ভায়ে ভাগাভাগি করে খেলাম। ক্ষিধে ব্যাপারটা যে কি তা সেদিন

হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। এরপর লকার খুলে বাবা কিছু ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট ও ফারপো-র একটা পুরো প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। পাঁউরুটিটা রেখে আমরা সবাই মিলে ব্রিটানিয়ার ক্র্যাকারগুলো নিমেষেই শেষ করে ফেললাম। বাবা চিন্তিত মুখে বললেন, 'যেমন করে পারিস গড়পারের খবরটা একটু নে। আমি যে আর সইতে পারিনে রে।'

কথাটা শেষ করলেন বাবা চাচাজানের দিকে তাকিয়ে।

'সকালে একজনকে ধরেছিলাম। কিন্তু কোনো উপায়ই বের করতে পারলেন না ভদ্রলোক। এখন অন্য সোর্স ধরতে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না, আল্লাহ ভরসা।'

আমরা আবার ফিরে চললাম। বাবার চোখ টলমল এটা বেশ টের পেলাম।

ফিরে এসে দেখি রান্না শেষ। রুমালে ফারপোর প্যাকেটটা জড়িয়ে একটা লকারে রেখে দিলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ততক্ষণে মন্টু ও লতিফ ভাইসহ সবাই জোড়াসনে বসে গেছেন। গোটা হাঁড়ি সামনে রেখে পরিবেশন করে সাবেক ও দলিল। গরম গরম ভাত ও ডালের ভাপ উঠছে কেমন প্রতি থালা ও পাত্র থেকে। ভাত— কতোকাল খাই নি!

রাতে কারও তেমন ঘুম হয় নি, তাই খাওয়া শেষে সবাই যখন ঘুমে কাতর সাবেক ও দলিল ওদের বিছানা পেতে দিল। সবাই শুয়ে পড়লাম। কিন্তু দিবানিদ্রা আমার সয় না। তাই উঠে বাইরে পা দিতেই দেখি অসুস্থ বাবা ক্লান্ত পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। আমরা সবাই খাওয়াদাওয়া করেছি কিনা এবং চাচাজান বাড়ির কোনো খবর জোগাড় করতে পারলেন কিনা এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। জবাব পেয়ে বাবা হয়তো সন্তুষ্ট হলেন না, তাই আমাদের আপিস ঘরের ডেরায় নতুন কিছু আশাব্যাঞ্জক সংবাদের আশায় ঢুকে পড়তেই আমি সেন্ট্রাল এভিনিউর দিকে পা বাড়ালাম। লোহার গেটের সামনে বেশ কিছু উৎসুক লোকের জটলা। কাছে যেতে দেখি সবার চোখ ওপারে একটা ঠেলাগাড়ির ওপর। ফিয়ার্স লেনের মোড়েই বলা যায়। কিন্তু ওকি! ঠেলাগাড়ি উপচে পড়ছে মানুষের লাশে। ২০-২৫ জনের লাশ তো বটেই। অবস্থাপন্ন বলেই মনে হলো— অন্তত জামা-কাপড় তাই বলে। পরে জেনেছি ফিয়ার্স লেনের মুসলমসান গুণ্ডাদের কাজ ওটা। প্রায় একশ গজ দূরে লাশ বোঝাই আরেকটা ঠেলাগাড়ি চোখে পড়ল। লাশের স্তূপ থেকে একজন যেন রাস্তায় নেমে পড়ল বলে মনে হলো। ভুল দেখছি না তো! চোখ রগড়ে দেখি ততক্ষণে লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, লক্ষ্য ওর ইডেন চক্ষু হাসপাতাল। থেমে থেমে এগোচ্ছিল। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কি আকুতি। আরো কয়েক হাত এগিয়ে হঠাৎ সটান শুয়ে পড়ল লোকটা— আর নড়াচড়া নয়। বুঝলাম বাঁচা ওর হলো না। ভোঁতা মনটাও শিটে মেরে গেল। চমক ভাঙল দারোয়ানের হেড়ে গলায়।

'আরে ইয়ে কৈ তামাশা হ্যায়, না কৈ মাদারি কা খেল? আপলোক ফটক সে ইধার চলে আইয়ে— নাহি তো পুলিশ কা গোলি খানে হোগা। আইয়ে, আইয়ে, পিছা করিয়ে।'

দারোয়ানের বাজখাই গলায় কাজ হলো। সুরসুর করে সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে এলো। কিছুক্ষণ পাহারায় থেকে দারোয়ান ব্যাটা খৈনি টিপতে টিপতে একটু মৌজ করতে আড়ালে গেলে আবার গেটের কাছে চলে আসি। আমার দেখাদেখি গুটি গুটি পা

ফেলে বাকি সবাইও জটলা পাকায়—জীবন্ত নাটকের দর্শক হতে কারও অনাগ্রহ নেই।

ফিয়ার্স লেনের মোড়ে তিনজন মুসলমান গুণ্ডাকে দেখা গেল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলছে এতদূর থেকে তা বোঝার কোনো উপায়ই ছিল না। একজনের হাতে আবার একটা রক্তাক্ত ছোরা! রামগুঁফো চৌগোঁপ্পা লোকটা হঠাৎ দূরে দাঁড়ান কয়েকজন পুলিশকে লক্ষ করে হাততালি দিয়ে নজর কাড়ার চেষ্টা করল। সুনসান রাস্তায় হাততালির শব্দগুলো দুধারের সারিবদ্ধ বাড়িগুলোয় ঠোকাঠুকি খেকে অট্টহাসি করে উঠল যেনবা। আড্ডাবাজ পুলিশের দলটা চমকে মুখ ফেরায়।

চৌগোঁপ্পা গুণ্ডাটা চুটকি মেরে লাশবোঝাই ঠেলাগাড়ি দুটো দেখিয়ে দিয়ে যেন একথাই বলতে চাইলে— ইয়ে ঝুটঝামেলা হাটাও জি! বুঝলেও তাই ওরা! এক হাতে পাগড়ি সামলাতে সামলাতে আরেক হাকে ব্যাটন, পিচঢালা পথে শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে আসে পুলিশের ছোট দলটা। বুটের শব্দে বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করে ওঠে।

ইতোমধ্যে ফিয়ার্স লেনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে গুণ্ডারা।

গুণ্ডাদের খোঁজে অযথা সময় নষ্ট না করে পুলিশেরা ঠেলাগাড়ি দুটো হাসপাতালের ভেতর নিয়ে আসল। কর্তৃপক্ষের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে ওপাশের একটা গলিল মুখে এক হতভাগিনী বৃদ্ধার লাশ নজরে পড়ে ওদের। কোন্ সোনামাণিকের ঠাকুরমা কিংবা হরিদাসের মা— কে বলতে পারে! অসাড় দেহটা চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে একরকম ছুঁড়েই ফেলে ঠেলাগাড়ির অন্যান্য লাশের ভিড়ে।

কিছুক্ষণ পর আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম। আশ্চর্য, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও কেমন অকাতরে ঘুমুচ্ছে সবাই। ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে গাট-টা একটু এলিয়ে দিলাম। সব কিছুই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ মানুষকে মারছে রামদা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে, ভোজালি দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে— যা কল্পনারও ছিল অতীত, তাই দেখতে হচ্ছে দু'চোখ দিয়ে! গড়পারে মা ভাইবোনেরা ভালো তো? মা! মাগো!

এমন সময় তোলবলে শরীরে সাবেক ঘরে ঢুকল। উস্কো খুস্কো চুল আর পাথরের মতো নিথর চোখ দুটো কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল। ধপাস করে মেঝেয় বসে পড়ে সে। যেন অনেক দূর থেকে কেউ বলে ওঠে :

'হায় আল্লাহ! আমার কপালে এই ছিলো!'

বোধকরি একটু জোরেই কথাটা বলা হয়ে গেছে। চাচাজান ও লতিফ ভাই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

'কেন, কি হয়েছে?' চাচাজান জানতে চাইলেন।

'হাসপাতাল থেকে অর্ডার হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত বা আহতদের স্ট্রেচারে করে আউটডোরে নিয়ে যেতে হবে। ফিয়ার্স লেনে যে কটা বাড়িতে গেলাম সবাই হিন্দু বড়লোক— রক্তে রক্তে বাড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে। ছেলে-বুড়ো-মেয়েমানুষ কাউকে রেহাই দেয়নি পিশাচগুলো। কিন্তু একটা ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম যেন কোনো শত্রুকেও তা দেখতে না হয়।' সাবেকের গলা ধরে আসে, চোখ দিয়ে দরদর কের চল গড়িয়ে পড়তে থাকে। আর কথা সরে না তার।

সবাই চুপ। সময় দেয় ওর আবেগ প্রশমিত হবার। একটু-বা লজ্জিত সে। চোখ মুছে কথা শেষ করে, 'বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে মা জাড়িয়ে আছে সন্তানকে— কিন্তু বাঁচেনি কেউ। চাপ চাপ শুকনো রক্তের মাঝে প্রায় দু টুকরো হয়ে যাওয়া মায়ের বুকে ঘুমিয়ে আছে চিরতরে প্রিয় সন্তান।'

কোনো কথা নয়। ভারী একটা বাতাস ঘরটাকে উথাল পাতাল করে দিয়ে যায়। বিকেল সাড়ে তিনটা হবে। শোয়া আর হলো না। সাবেকের কাহিনীটা আমায় বিশ্রাম নিতে দিলে না। বেরিয়ে পড়লাম একাই। চলে এলাম মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে। এ কি! পোশাক-চেরা ফুলে-ওঠা এত লাশ! পিরামিডের মতো সাজানো— শিশু, বুড়োবুড়ি, যুবা, ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান— সবাই আছে। একটা গন্ধ যেন পাচ্ছি। পচা গলিত লাশের গন্ধ। পেটে যেটুকু-বা পড়েছিল বেরিয়ে আসে বুঝি।

অ্যাম্বুলেন্স আর গাড়ি করে হতাহতের আসা-যাওয়া আগের মতোই বিরামহীন। আটকে পড়া জীবিত ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের বাঁচাবার তাগিদে রেডক্রস থেকে খাবার ব্যবস্থা করেছে— এমন একটা খবর চাউর হতে সবাই ছোটে লঙ্গরখানা লক্ষ করে। লম্বা লাইন পড়েছে। খাবার দেয়া শুরু হয়েছে সেই দুপুর থেকেই। লঙ্গরখানার যা দস্তুর— খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। আমরা লাইনে দাঁড়াবো কিনা ভাবছিলাম, কারণ সাবেক-দলিলেরা আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তবে যা অবস্থা তাতে রাতের খাবারটা কালকের জন্যে রেখে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বিবচেনা করেই লাইনে দাঁড়ান গের। কিন্তু খিচুড়ি যা জ্বু তা মুখে দেয়া যায় না। আমাদের ভাগের খিচুড়িটা সাগ্রহে গ্রহণ করল এক অভুক্ত পরিবার। আমরা না খেলেও অনন্যোপায় আর সবাইকে খাওয়ার অযোগ্য সেই খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলতে দেখে বুঝলাম ক্ষিদের কাছে সব চলে।

গলিত লাশের দুর্গন্ধটা এখানেও পৌঁছে গেছে। বিবমিষার ভাবা থেকে থেকে জানান দিচ্ছিল। পাশ দিয়ে লাশভর্তি একটা ঠেলাগাড়ি হাসপাতালের ডোম্‌রা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে উন্মুক্ত মর্গে। পচে ফুলে কি বীভৎস। বেচারারা ময়নাতদন্তের পরিহাস থেকে বাঁচল।

এমন সময় ডুক্‌রনো কান্নার শব্দে একটু অবাক হলাম— এত এত লাশের মাঝে যাদের বসবাস সেখানে সব কান্নাই শেষ হয়ে গিয়েছিল সে কবেই। তাহলে এ কার কান্না? একটা রিকশায় নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া দুটি লাশ— চৈতন চুটকি দেখেই বোঝা যায় উড়ে। রিকশার পাশে পাশে ছুটে আসছে এক বৃদ্ধ উড়ে, সে-ই কাঁদছিল। অনেকেই তাকে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন করে জানা গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা।

ফিয়ার্স লেনের একটু ভেতরেই বেশ কিছু উড়ে একটা বাড়িতে একত্র বাস করত। এদের বেশিরভাগই ছিল পেশায় ধোপা। সংখ্যায় প্রায় ৪০/৫০ জন। ১৬ই আগস্টের রাতে দু'তিন জন মুসলমান গুণ্ডা ওদের ডেরায় হানা দেয়। সবাইকে কচুকাটা করে ঐ গুণ্ডাগুলো। ল্যাট্রিনের ভেতর লুকিয়ে থেকে ঐ বৃদ্ধ লোকটি কোনো রকমে প্রাণে বাঁচে। বিকেলে পুলিশ যাওয়ায় সে পায়খানা থেকে বেরিয়ে তার দু'ভাইয়ের লাশ নিয়ে এই তো ফিরল। বাকি সবার লাশ পড়ে আছে ঐ ডেরায়।

দু'তিনটে গুণ্ডার সঙ্গে লড়তে পারল না ৪০/৫০ জন উড়ে! ভাবি আর অবাক হই— সবাই যদি রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ত পালাতে পথ পেত না ঐ পাষণ্ডেরা। মাত্র তিনজনের ভয়ে 'কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে' ওদের!

পাঁচটা বাজল বুঝি। আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা অনেকক্ষণ ধরেই, আর সেই সঙ্গে একটা মিষ্টি হাওয়া। এবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দৌড়ে প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। পানি ঢুকে নটিবয়টা বেশ ভারি হয়ে গেছে আর হাফপ্যান্টটা তেমন না ভিজলেও শার্টটা ভিজে একশা।

এক সময় বৃষ্টিটা ধরে এলে ঘুরতে ঘুরতে মেডিক্যাল কলেজ কম্পাউন্ডে চলে এলাম ব্লাড ব্যাঙ্কের পাশে চাচাজান, বড় ভাই ও ফিরোজ ভাইকে দেখতে পেলাম। কাছে যেতে বড় ভাইয়ের কাছে পেলাম মৃদু ভর্ৎসনা। চাচাজান একটা মিলিটারি ট্রাকে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বাড়ি পৌঁছনোর ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। জানলাম তিনি মুসলিম লীগের একজন নেতা, নাম লাল মিয়া।[৩] খুবই প্রতাপশালী। অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি বাড়ির বিপদের কথা জেনেও আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না। তবে আমাদের বাড়ির খোঁজখবর নেবেন এমন একটা আশ্বাস দিলেন। তাঁকে গড়পারের ঠিকানা দেয়া হলো এবং একটা ফোন নম্বর।[৪]

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। না আর কোনো আশাই নেই বাড়ি যাওয়ার। এমন সময় কফিল দার[৫] সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি সব কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু কোনো সাহায্য করা তাঁর আয়ত্বের বাইরে বলে জানালেন। মৃতদেহের তীব্র গন্ধ আরো কটু বলে মনে হলো। আউটডোরের পাশ দিয়ে ডেরায় ফেরার সময় দেখলাম সকালবেলার লাশের পিরামিডটা আরো বড় আরো উঁচু হয়ে নিজের গৌরব ঘোষণা করছে। রেডক্রস থেকে রাতের খিচুড়ি দেয়অ শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। সাবেক-দলিলেরাও তৈরি। রান্না শেষ। এখন আমরা বসলেই পরিবেশন করতে পারে তারা। তবে পেট পুরে খাওয়া নাস্তি। কিন্তু যেটুকুইবা খাব তর পুরো কৃতিত্ব দলিলের। বলিহারি ওর সাহস। সেন্ট্রাল এভিনিউ ভেঙে কিছুদূরেই ছিল এক হোটেল— প্রতি পদে বিপদের কথা জেনেও সে ঐ হোটেল থেকে সংগ্রহ করে এনেছে ভাত। সকলে অল্প অল্প করে তাই খেলাম। দলিল যদি এ ব্যবস্থা না করত তাহলে আমাদের রেডক্রসের ঐ বারোয়ারী খিচুড়ি খেয়েই পেটপুজো করতে হতো।

খাওয়া শেষে সাবেক ও দলিল কোথায় কি করে শোবে সে কথা না ভেবে ওদেরই পাতা বিছানায় ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৭ আগস্ট, দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন এভাবেই আমরা পার করে দিলাম।

তথ্যপঞ্জি

১. সব দিকেই পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সমাজে একটু দাঁড় করিয়ে দেবার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩) চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্যে কোটার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবা বোধকরি এই জোরেই বেশ কিছু লোককে চাকরির সংস্থান করে দিতে পেরেছিলেন।

২. বাবার অনুগত পিয়নদের বাড়ি ভাড়া করে থাকার মুরোদ ছিল না। ট্রপিক্যালেই স্টোর রুম নয়তো রান্নাঘরে কি বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শয়ন রচনা চলত ওদের।

৩. লাল মিয়া নামে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। ফরিদপুর ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ। ছাত্রজীবনেই কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯২০ খ্রি. অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারাবরণ। ১৯২৪-এ তাঁর উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং যোগদান করেন মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও দুবারই কারাবরণ। ১৯৩৬ ও ১৯৪০-এ কংগ্রেসের মনোনয়নে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪০-এ কলকাতার 'অন্ধকূপ হত্যা' স্মৃতিসৌধ অপসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও গ্রেফতার বরণ। ১৯৪৩-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৫-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য হন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫-র মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন। লাল মিয়া কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জন্ম ১৯০৫, মৃত্যু ১৯৬৭।

৪. আমাদের দোতলার ভাড়াটে ফুর্তিদের ফোন নম্বর। অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায় নি। বোধ করি বিকল ছিল।

৫. কফিল উদ্দিন আহমেদ। সম্পর্কে আমাদের ভাই। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিশেষভষাবে অনুরুদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে ঢাকার সার্জন জেনারেল পদে বৃত হয়েছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮ই আগস্ট, ১৯৪৬। আজ দাঙ্গার তৃতীয় দিন।

সকালে উঠে প্রথমেই মায়ের কথা মনে হলো। রাতে মা ও ভাইবোনদের ঘিরে বাজে স্বপ্ন দেখেছিলুম। এটা তারই জের। বরাবর ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার প্রতি মায়ের পক্ষপাত ছিল, একটু আলাদা আদর ছিল। সন্ধে লাগার আগেই খোকন বাড়ি না ফিরলে ওঁর উষিপিষির অন্ত থাকত না। আবার ফিরলেও জুটত না বকুনি কিংবা হতো না পাঁচাপাঁচি— আগলে ধরে কখনো অস্ফুটে কখনো অশ্রুধারায় আকুল আবেগের কথা বলতেন। তাই বড় ভাইকে বললাম, আজকে বাড়ি যাচ্ছি তো?'

'বললেই তো আর যাওয়া হবে না। অবস্থাটা দেখছিস তো। ফিরোজভাই চাচাজান এঁরা তো কম করছেন না। দেখা যাক আজকে কি হয়।' বিষণ্ন জবাব বড় ভাইয়ের।

প্রায় তিন দিনের জমে যাওয়া লাশের বোঁটকা গন্ধে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আছে। তবে এখন আর গা গোলায় না— সয়ে গেছে। আজকে আউটডোরের আঙিনায় লাশের পিরামিডগুলোর গা আরো ভরে উঠেছে। লাশ-রক্ত-গন্ধ— সব মিলেমিশে ঘোঁট পাকিয়ে অনুভূতিগুলো সব যেন লুটে নিয়েছে।

কিন্তু লোপাট করতে পারে নি যা সে তো পেট— এখানে কারো গা-জোয়ারী চলে না। সাবেক-দলিলেরা আজ হাত গুটিয়ে বসে আছে— যতটুকু করবার ওরা করেছে। এখন সবার এক গতি— বারোয়ারী খিচুড়ি। কফিলদা[১] সে ব্যবস্থা করে দিলেন। রেডক্রস থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে খাবারের কার্ড জোগাড় করে দিতে আমরা সাবই ইডেন আই হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ৭০০/৮০০ লোকের লম্বা লাইন দেখে সবাই মুষড়ে পড়লাম। এতগুলো লোকের পেছনে দাঁড়ালে লঙ্গরখানা পৌঁছুতে দুপুর গড়াবে এ ধরেই নেয়া যায়। তারপর কপালে যে 'সুস্বাদু' খিচুড়ি জুটবে পেট নাবা ছাড়া তার আর কি ভূমিকা থাকবে। তাই সবাই চলে এলাম ট্রপিক্যাল স্কুলের ডেরায়। ভয়ঙ্কর ক্ষিদে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একটু লিকার-চা খাব সে গুড়েও বালি, কারণ, সাবেকদের চায়ের গুঁড়োর সঞ্চয়ও শেষ। সকালবেলা নাস্তা খাওয়ার আগে, বরং বলতে হয় কয়লার চুলোয় চোখজ্বালা-করা ধোঁয়া ধাওয়া করার আগেই 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় একবারটি চোখ বুলানো অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গত দু'দিনে ওকথা মনেই আসে নি। আজ কেন মনে হলো বলতে পারব না। আজ তো মার কথাও খুব করে মনে পড়ছে, দোতলার ফুর্তিদের কথাও। গত সপ্তায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে পাওয়া রঙিন রুমালের কথাও মনে পড়ে যায়। যেতেই, পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনি রুমালটা— জিতে কিছু পাওয়ার আনন্দই আলাদা।

আর ঐ যে গেঁড়েচৈতন উড়েটা, ওর করুণ বিলাপের কথাটাও থেকে থেকে দোলা দিয়ে যায়।

'এ কি, তোমরা এখানে সবাই বসে যে! ওদিকে রেডক্রস থেকে খাবার দেয়া হচ্ছে সে খবর রাখ? নাকি, খেয়ে এসেছিস তোরা?' বাবার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পাই। শেষ প্রশ্নটা আমাদের দু'ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলায় আমি জবাব দিলুম, না, খাই নি।'

'কেন?'

এই প্রশ্নটা যে সকলের জন্যে তা বুঝতে পেরে লতিফ ভাইয়ের সঙ্গে সকলেই প্রায় একযোগে বলে ওঠেন, 'কি করে খাবি বলুন, খিচুড়ি যে একেবারে খাবার অযোগ্য।'

'কি বললে? খাবার অযোগ্য! বলিহারি তোমাদের কাণ্ডকারখানা! এই যে পাচ্ছ হাজার শুকুর করো। এখন না খেয়ে থাক— আমার কি বলার আছে।' রাগ ঝরে পড়ে বাবার কণ্ঠে, যদিও অসুস্থ দেহে বাবার মোটেও রাগ মানায় না। 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো।' বলে বাবা আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে নিজের হাসপাতালে চলে এলেন। লকারের ওপর ট্রেতে বাবার পথ্য, অর্থাৎ ভাত ও মুরগির সুপ ঢাকা দেয়া ছিল। কিছুটা খেয়ে হয়তো অভুক্ত ছেলে দুটোর কথা মনে পড়ে থাকবে। ভাগ করে দুজনে খেলাম। কিছুক্ষণ বাড়ির কথা হলো, আমাদের বাড়ি যাওয়া নিয়েও। কিন্তু কোনো সুরাহাই হলো না। অসুস্থ বাবাকে খুব অসহায় মনে হলো। আমরা ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেছন ফিরে দেখি বাবা বাঁ হাতটা দরজায় আলতো করে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে। আবার একা হয়ে গেলেন বাবা। আজ বুঝতে পারি নিঃসঙ্গ বাবাকে পুরো পরিস্থিতিটাকে যুঝতে গিয়ে কি অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে আসন্ন বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার, আরেকদিকে গড়পারে সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত পল্লীতে পরিবারের আটজন সদস্যকে ঘিরে ভয়ঙ্কর আশঙ্কা। ওয়ার্ডে শুয়ে বসে পায়চারী করে এবং যুঝতে না পেরে হাসপাতালের নিয়ম ভঙ্গ করে আমাদের কাছে সান্ত্বনার আশায় ছুটে ছুটে আসা— এ সবই মনের পটে আঁকা হয়ে আছে।

বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় ভাই চলে গেলেন ডেরায়, আমি মোড় নিলাম হাসপাতালের সদর দরজার দিকে। পেটা লোহার গেটের সামনে একটা বোর্ড ঝোলানো দেখলুম, তাতে বড় বড় করে লেখা : 'NO ADMISSION'। অর্থাৎ নতুন কোনো রুগি ভর্তি করা হবে না। নিজের চোখেই তা দেখছি, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে, করিডোরে, উন্মুক্ত আঙিনায়, নির্বাক লাশগুলোর কথা ছেড়েই দিলুম, আহত হতভাগাদের করুণ গোঙানি ও আর্তনাদে দিবারাত্রি অনলস কর্মরত ডাক্তার ও নার্সদের কি অসহায় অবস্থা। হত-আহতপূর্ণ গাড়িগুলোকে সদর দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, পরামর্শ দেয়া হচ্ছে অন্য কোনো হাসপাতালে যেতে। সেকালে কলকাতায় বড় ও মাঝারি মাপের হাসপাতালের সংখ্যা (হোমিও, মানসিক, দন্তচিকিৎসালয় ইত্যাদি বাদে) বারো-র বেশি ছিল না[৩]। কোথাও ঠাঁই না পেয়েই ছুটে ছুটে আসছিল আহতদের গাড়িগুলো। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে গড়ে যদি ৪০০ করে (আমার ১৯ আগস্টের ডায়েরির পাতায় মেডিক্যাল কলেজে আহতের সংখ্যা 'প্রায় ৮০০' লেখা আছে।) আহতের সংখ্যা ধরি, তাহলেই প্রায় ৫০০০ হাজারে গিয়ে পৌঁছুবে সে সংখ্যা!

আজও আমাদের বাড়ি যাওয়া হলো না।

রাতে বাবার পথ্যে আমরা দু ভাই আবার ভাগ বসালাম। ক্ষিদের জ্বালায় চাচাজান ও অপরাপর সঙ্গীসাথীদের অযোগ্য খিচুড়িই যোগ্য মনে হলো সে রাতে।

পরদিন ১৯ আগস্ট একটা আশার আলো যেন জেগে উঠল। কফিলদা ও ফিরোজ ভাইয়ের চেষ্টাতদবিরে একজন পাঠান সৈনিককে মাত্র দশ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে রাজি করানো গেছে— আমাদের পৌঁছে দেবে বৈঠকখানা অঞ্চলে। সবাই মুক্তির আনন্দে খুব খুশি। সংবাদ পেয়ে বাবা খুশি আবার বিষণ্ণও। চাচাকে বার বার বলে দিলেন যাতে গড়পারের সংবাদটা একবার নেন এবং নিরাপদ-সংবাদটা পান। অধীর বাবা আমার! একে একে আমরা সবাই মিলিটারি ট্রাকে উঠলাম— চাচাজান, ফিরোজ ভাই, লতিফ ভাই, মতি ভাই, সুরুজ ভাই, বড় ভাই ও আমি। শব্দ করে সদর দরজা খুলে যেতে বাঁ দিকে মোড় নিল ট্রাক। আজও অলেজ স্ট্রিট মড়ার মতো পড়ে আছে— দাঙ্গার তিনদিন পরেও! মির্জাপুরের মোড়ে এসে বাঁক নিলে ট্রাক। কলেজ স্কোয়্যার, সিটি কলেজিয়েট স্কুল পার হতেই হঠাৎ খেয়াল হলো সামনেই তো জুবিলি স্কুল— মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত স্কুল। হিন্দু অধ্যুষিত পল্লীর এই স্কুলের ছাত্রদের কি গতি হয়েছে কে জানে। কারণ স্কুলের সঙ্গেই ছিল ছাত্রাবাস।[৪] ট্রাকটা স্কুলের কাছাকাছি আসতেই গতি মন্থর হয়ে গেল। তাকাতে দেখি সারা রাস্তা জুড়ে বিভিন্ন দেহভঙ্গির পোড়া লাশ— কারো ঝলসানো দু'হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, কারো মাংসহীন করোটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারো পুরো দেহটাই ঝলসানো কিন্তু আশ্চর্যভাবেই চোখের মণি দুটো অক্ষত, কেউ উবু হয়ে আছে কেউ চিৎ শয়ান— সে এক ভয়াল ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য। দেহগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রায় সবাই বালক। স্কুল লাগোয়া একটা মণিহারি পানের দোকান ছিল। হেয়ার স্কুল-প্রেসিডেন্সির মাঠে খেলতে যাওয়া-আসার পথে দেখতাম কর্মব্যস্ত মালিক ও তার ছেলেকে ঐ দোকানে। আজ ওদের পোড়াদেহ দেখে চিনতে কষ্ট হলো না— বাবা উপরে ছেলেটা ফুটপাথে। পুরো স্কুলটাই ঝলসানো দেখলাম— তার মানে ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে পুড়েছে সবাই— মাকে ডেকেছে, বাবাকে ডেকেছে, অনুনয়-বিনয় করেছে একটু বাঁচার জন্যে— না, কেউ সাড়া দেয়নি সে ডাকে— বদ্ধ ঘরে কি ভয়ঙ্কর সমাপন! আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, আমার চোখের সব জল স্কুলের আগুনে শুষে নিয়েছে। লাশগুলো বাঁচিয়ে ট্রাক ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। শেষ লাশটা পাত হতেই ট্রাক গর্জন করে আবার ছুটল গন্তব্যস্থলের দিকে। ধাবাড়ে ট্রাকটা নিমেষেই হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে পড়ল— ঐ তো সামনেই মুসলিম পল্লী! বাঁয়ে আমাদের মিত্র স্কুলকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি— বুকটা ছাঁৎ করে উঠল, এ'কদিন ক্লাস-ট্যালাস হয়নি তো! তা কি করে হয়— এত সব কাণ্ড হয়ে গেল, এতগুলো লোক মরল, পঞ্চানন স্যার[৫] স্কুল খোলা রাখেন কি করে। ট্রাক ততক্ষণে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে বৈঠকখানা রোডে পড়েছে। বেশ তো লোকজন দেখছি। অনেক দিন পরে রাস্তাঘাটে লোকের আনাগোনা দেখে বেশ লাগল। মাত্রই চার দিন আগে দিগম্বর করে ছেড়ে দেয়া হতভাগ্য নওশের আলীর বাড়িকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে আমাদের ট্রাকটি গৌখানার সামনে ৯০/১ বৈঠকখানা রোডের মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের স্মৃতিমাখা বাড়িতে এসে থামল।[৬] চাচাজান

ছাড়া আমরা সবাই নেমে পড়লাম। ঐ একই ট্রাকে চাচা যাবেন আমাদের গড়পারের বাড়ি। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম— কিন্তু ওখানে গিয়ে কি দেখবেন কি শুনবেন— এমন একটা সহজবোধ্য আশঙ্কার কারণে বারণ করতে আমরা দু'ভাইই বেশ মুষড়ে পড়লাম।

ট্রাক না ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সস্তি পাচ্ছিলাম না। তখন দুপুর একটা দুটো হবে। কলকাতার বস্তি এলাকার কাচা পায়খানাগুলো সাফসুতরো করে গরুর পিপেগাড়িগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে গৌখানায় ঢুকছিল। তবে দাঙ্গার কারণে অধিকাংশ গাড়িই সারিবদ্ধ হয়ে ঝিমুচ্ছিল। এই মুহূর্তে যদি ঘুঘু একটু কাঁদত। কাঁদল, কিন্তু সে ঐ সোনালি ডানার চিল।

কত যুগ পার করে এলাম জানিনে। বিকট শব্দ করতে করতে মিলিটারি ট্রাকটা চাচাকে নাবিয়ে দিয়েই পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে পালাল।

'সবাই ভালো আছে।' আমাদের উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে চাচা শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন।

তথ্যপঞ্জি

১. অখণ্ড ভারতে একমাত্র বৃহত্তর বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয় সম্বোধনের ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়। মুসমানেরা, যথাক্রমে, যদি বলে— চাচা-চাচি, ফুফাফুফি, ভাই-বুবু (ক্ষেত্রবিশেষে আপা), নানা-নানী, দাদা-দাদি, দুলাভাই-ভাবি (ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্বোধন শেষে 'জান'/'আম্মা' ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়) ইত্যাদি তাহলে হিন্দুরা বলবে খুড়ো-খুড়ি, কাকা-কাকি, পিসা-পিসি, দাদা-দিদি, দাদামশাই-ঠাকুরমা/ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা/ঠাকুরদাদি, জামাইবাবু-বৌদি ইত্যাদি। বাবা-মা (কিছু ক্ষেত্রে আব্বা-আম্মা) এবং মামা-মামির উভয়ের ক্ষেত্রে একটা বোঝাপড়া আছে। তবে বাবা শব্দ ছাড়া সব শব্দই সংস্কৃত, হিন্দুস্তানি অথবা প্রাকৃত শব্দ থেকে উৎপন্ন। বাবা তুর্কি শব্দ এবং কাকা সংস্কৃত তাত থেকে উর্দু (মতান্তরে ফারসি) চাচা হয়ে কাকা। ওড়িয়া ভাষায় ককা, হিন্দিতে কাকা, চাচা, মারাঠীতে কাকা। তবে বাংলায় কাকা-র প্রচলন তেমন প্রাচীন নয়। পূর্ববঙ্গে কিছু কিছু এলাকায় এই যেমন বিক্রমপুরে বিশেষ করে মাওয়া-মেদিনীমণ্ডল অঞ্চলে দাদা-দিদি এবং কাকার প্রচলন মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। তাইতো কফিল ভাই নয়, কফিলদা তথা দাদা।

২. আমাদের বাড়িতে আগে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' রাখা হতো। যতদূর মনে পড়ে পাকিস্তানের আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে, ১৯৪৬-এর গোড়ার দিকে বাড়িতে প্রথম স্টেট্‌স্‌ম্যান জায়গা করে নিল। মুসলিম লীগ সমর্থক 'স্টার অফ ইন্ডিয়া' কিংবা 'মর্নিং নিউজ' নয় কেন, পরবর্তীকালে এ প্রশ্নটা তুললে বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বানান নিয়ে প্রেসের ভূতেরা উটকো ঝামেলা করত না বলেই স্টেট্‌স্‌ম্যানকে পছন্দ করেছিলাম। তারপর ধর, ইংরেজিটা শানানো যেত, এটাও বাড়তি লাভ বৈ কি।' এখানে উল্লেখ্য, ভারত ভাগের পরেও ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পর স্টেট্‌স্‌ম্যান আমদানি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঢাকাতে ঐ স্টেট্‌স্‌ম্যানের জায়গা আর কোনো পত্রিকা দখল করতে পারে নি।

৩. স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে মাত্রই কয়েক মাস আগে বাবা এমনি এক হাসপাতাল 'লেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে' সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ দেহে কাজে যোগ দেবার পর এই হাসপাতালে বহু দাঙ্গাপীড়িত লোকদের সেবা করতে পেরে বাবা কিছুটা হলেও দায়মুক্ত হয়েছিলেন।

৪. এই ছাত্রাবাসে কিছু বাইরের মুসলমান ছাত্রও বাস করতেন। যেমন আজকের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস জহুরুল হক। যখন জুবিলি স্কুল পুড়ছিল তখন জহুরুল হক ওঁর রুমে শুয়েছিলেন। ছাত্রদের আর্ত চিৎকার, দম আটকানো ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে হক সাহেব হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে ঘরটাতে ছিলেন সেটা চিলেকোঠার মতো ছিল। গুণ্ডারা টের পায়নি ওপরে লোক আছে। রুমমেট সেদিন ছিলেন না। গোলমাল একটা হবে সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলেন। কিন্তু তার চপট যে এতটা গড়াবে ভাবতে পারেননি। তাহলে সকালেই মুসলমান পাড়ার নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারতেন। ভুলটা কবুল করে নিয়ে উপস্থিত প্রাণটা কিভাবে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর হক সাহেবের জবানীতে :
সিঁড়ি দিয়েই নাবতে হবে আমাকে। কিন্তু গুণ্ডারা নেই তো আশেপাশে। কিন্তু এটা বুঝলাম, যা করতে হবে তাড়াতাড়িই করতে হবে, কারণ আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ। দোতলায় নেবে দেখি শুধু আগুন আর ধোঁয়া। বাইরে থেকে শেকল আটকে দেয়ায় ছাত্রেরা কেউ বেরুতে পারছিল না। আমিও যে এগিয়ে শেকলগুলো খুলে দেব সে উপায় নেই, দরজায় কাঠগুলো দাউ দাউ করে মহানন্দে জ্বলছিল। খুব স্বার্থপরের মতোই আবার সিঁড়ি ভাঙি।
নিচে নেবে স্কুল ভবনের পেছনে চলে যাই। এ জায়গাটা বাড়ির চাঁদাড় বলেই বোধ করি বেশ নির্জন, যা কিছু হল্লা স্কুলের সামনে রাস্তার ওপর। এমন একটা বিজয়, একসঙ্গে এতগুলো নেড়ের অক্কা পাওয়া, এ তো আর দুটি চারটি কথা নয়! ওদের উল্লাসের ধ্বনি এখান থেকেও পাচ্ছিলাম। যদি বাঁচতে হয় পাঁচিলটা টপকাতে হবে। ওপারে কোন বিপদ ওত পেতে আছে জানি নে। কিন্তু গুণ্ডারা কখন এসে পড়ে এ ভাবনাটাও পেয়ে বসল। কাজেই আর দেরি না করে পাঁচিলের ওপর উঠে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। এপারেও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। একটা বিচালির মড়াই আর ওপাশে কিছু নিরীহ গরু। তার মানে এটা খাটাল। খাটাল পেরুতে যাব—কিছু লোকজনের সাড়া পেলাম, একটা রাস্তাও নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে বিচালির আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। খাটাল অবধি লোকগুলো এলো। কি সব কথাবার্তা কইল। তারপর আবার সব চুপচাপ। ঠিক করলাম রাত হলেই বেরুবো। বিচালি-গোবর-চনার মিলিত উৎকট গন্ধটা ক্রমে সয়ে আসল। কয়েকটা পোকা মাঝে মাঝেই বিরক্ত করছিল। নড়াচাড়া করতেও সাহস পাচ্ছিলাম না, পাছে শব্দ হয়। এভাবে ৩/৪ ঘণ্টা কাটাবার পর বুঝলাম সন্ধ্যারাত পেরিয়ে যামিনী এসেছেন। কাজেই বিচালির আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ আগেই দুধ দোয়া হয়ে গেছে, গরুরা নির্জীব। আস্তে আস্তে পা ফেলে রাস্তায় পড়েই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করি। অপরিচিত গলি ভেঙে অবশেষে পূরবীর কাছে এসেই এক দৌড়ে মির্জাপুরের মুসলিম পল্লীতে পা দিয়ে হাঁফ ছাড়ি।

৫. পঞ্চানন মণ্ডল। মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)-এর তৎকালীন হেডমাস্টার।

৬. ঐ কলকাতায় যেবার ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের আতঙ্কে শহর ছেড়ে সবাই পালাচ্ছিল তখন বাবা পড়াশুনোর ক্ষতি হবে ভেবে আমাদের দু ভাইকে নিজের কাছে রেখে মা ও ভাই-বোনদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেশে। ১০/সি পাটোয়ার বাগানের মস্তো বাড়ি ছেড়ে বাবা উঠে এসেছিলেন এই ৯০/১ ঠিকানায়। দোতলায় ছিল সূরুজ ভাইদের পরিবার, একতলায় মেসের মতো— আমরা ও আমাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত কিছু বান্ধব। মনে পড়ে আজও বিপুল বপুধারী হাসকুটে ফজলু কাকার হাসির হররার কথা, হ্যাগার্ডের 'শী' পড়িনি বলে ঐ যাঁর কাছে অবজ্ঞা কুড়িয়েছি সেই মন্টু ভাইয়ের কথা, একটি আপেল আনলেও মেসের সকল সদস্যকে ভাগ করে দেয়ার সেই ডালহৌসি-ফেরা কেরানি লতিফ ভাইয়ের কথা, এক রিক্সা বোঝাই রবীন্দ্র রচনাবলি নিয়ে বাড়ি ফেরা সেই আশ্চর্য যুবক সূরুজ ভাইয়ের কথা, আরো কতো জনের কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'সবাই ভালো আছে' এই ছোট্ট বাক্যটি আমাদের উদ্বিগ্নতা প্রশমনে যথেষ্ট বলে মনে না হওয়ায় তখনই বাড়ি যাওয়ার জন্যে চাচাকে ধরে বসলাম।

'আগে বললি না কেন, তাহলে মিলিটারি ট্রাকটাতেই যাওয়া যেত।' একটু বিরক্তিই ঝরে পড়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে।

আজ বুঝি ঘটনা পরম্পরায় চাচার বুদ্ধিশুদ্ধিতে ধ্বস নেমেছিল, নাহলে এক বালক ও সদ্য যুবার প্রতি এমন অভিযোগ তিনি করতেই পারেন না। প্রশ্নটা করেই বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাই 'দেখি তাহলে আরেকটা গাড়ির চেষ্টা করি' বলে আমাদের মেস-বাড়িতে[১] মন্টু-লতিফ ভাইদের কাছে রেখে গাড়ির খোঁজে বেরুলেন। কিন্তু সম্ভব হয় নি। সেদিন আমাদের মেসেই রাত কাটাতে হয়। পরদিন অবশ্য খুব একটা বেগ পেতে হয়নি, কারণ কলকাতার সর্বত্র তখন ট্রুপ-ক্যারিয়ার ট্রাকের সরব আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল। কত টাকায় রফা হয়েছিল জানি নে। পাঠান সেনাদের পাশে বসে পড়লাম। গাড়ি কেশব সেন স্ট্রিটে পড়ে ডান দিকে বাঁক নিলে। দুপাশের হতপ্রভ বস্তি বাসীদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত দেখলাম— মনে হলো হতচেতন কিছু লোক ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। তবে হিন্দু পাড়া বাদুরবাগানের মোড়টা মড়ার মতো পড়ে আছে। বড় ভাইয়ের বন্ধু সরখেলরা ভালো আছে তো? রাজাবাজার-নারকেলডাঙার মোড়ে এসে গাড়ি এবার বাঁ দিকে আপার সার্কুলার রোডে। প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। অন্যান্য দোকানের সঙ্গে কসাইয়ের দোকানটাও বন্ধ— গরু বলে মোষের মাংস বিক্রির 'সুনাম' যার যথেষ্ট। পরে মনে হয়েছে, গরু নয় মোষ নয়, দাঙ্গার ঐ ঘোর কলিকালে ওর হাতে মানুষের মাংসটাও বুঝি প্রাধান্য পেয়েছিল বেশি!

ট্রাকটা যত এগোয় বুকের ধক্‌পুকুনি তত বাড়ে। কি দেখব গিয়ে, কেমন দেখব। গাড়ি একে একে সায়েন্স কলেজ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পেরিয়ে ছুটে চলেছে। ঐ তো গড়পারের মোড়, আর, আর ইলেকট্রিক পোস্টের ধারে ওগুলো কি? কি? লাশ? অ্যাতো লাশ! কাদের লাশ ওগুলো? কেঁদেই ফেলব বুঝিবা।

আরো কাছে এসে গেছি এবার। না, না তো, ছড়ানো-ছিটানো জঞ্জাল। চারদিনের জঞ্জাল! চোখের ও মনের ধন্দ বলে কথা! মনটা একটু ঠাণ্ডা হলো বটে। মানিকতলা নতুন মার্কেটের[২] উল্টো দিকে যে সরু রাস্তাটা গড়পারের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তার চার-পাঁচটে বাড়ির পরেই বুলু-অমলা-আরতিদের ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি। ট্রাকটা বিকট শব্দে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমরা নেমে পড়লাম। কি সুননান!

হঠাৎ করেই আশেপাশের বাড়ির বন্ধ জানালাগুলোর খড়খড়ি তোলার চাপা শব্দ ভারি চমকে দেয়— পাড়াপড়শীদের কৌতূহলী চোখ আমাদের জরিপ করে। সদর দরজা বন্ধ ছিল। কড়া ধরে শব্দ করতে তেতলায় আমাদের ফ্ল্যাটের জানালার এক পাট খুলে যায়— মা!

দু'এক মিনিটের মধ্যেই সদর দরজা খুলে যায়। খুলে দেন ফুর্তিদের নওয়াব কাকা। তেতলায় উঠতেই সিঁড়ির মুখে দেখি ছোট ভাই মন্টু[৩] ও অন্যান্য বোনদের ঘিরে মা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দু' ভাইকে জড়িয়ে ধরে মার সে কি কান্না— ধরাতল বুঝি ভেসে যায়।

কিছু পরামর্শ দিয়ে চাচা মিলিটারি ট্রাকে ফিরে গেলেন বৈঠকখানায়, তাঁর ডেরায়।

এবার আমরা একটু একাকী হলাম। মাকে দেখি, ভাইবোনদের দেখি, বিশ্বাস হয় না; আমাদের দেখে মায়েরও অবিশ্বাস। এ যেন মর-লোক থেকে ফেরা আমরা কতিপয় প্রেতাত্মা। চারদিন আগেকার সরব প্রাণোচ্ছল কলকাতাকে আর চেনাই যায় না। নীরব ও বিষণ্ন কলকাতার আমরা ক'জন নিঃশব্দেই আমাদের কথা সারি। আমাদের কাছে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন মা। তারপর নিজে গত চারদিনের সালতামামি শোনালেন :

'তোরা সকালে গেলি, লাহাদের দোকানের সুমুখে দেহাতি মুসলমান লোকটাকে ছাতাপেটা ইঁটপেটা করে থেতলে মারলে, তা নিজেদের চোখে দেখেও গেলি।' বিবেকানন্দের মোড়ে নিজেও মার খেলি, তবু আমার মানা শুনলি নে। কি, না বড় মাপের শান্তি মিছিল যখন গেল, 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' রব তুলেই গেল, সব ঠিকঠাক, যাওয়া যায় এবার। কিন্তু জানিস খোকা, মিছিল গেল, তোরাও গেলি, হঠাৎ সব কেমন ফাঁকা ঠেকল আমার, সুনসান ভাবটা কেমন যেন গা ছমছম করা, ভয়ে সেঁধিয়ে গেলুমরে।

তারপর ধর, থেকে থেকে 'বন্দোমাতরমে'র জিকির আছে না! মানুষের মুখ থেকে বেরুনো কোনো শব্দ যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা তো জানা ছিল নারে খোকা! তোদের বাবার চিন্তা, ভূতভবিষ্যতের চিন্তা সব গুলিয়ে গেল যখন বিকেল গড়িয়ে সঙ্গে নাবল— ঐ তোরা যেখানে ফুটবল খেলিস— সূর্যের শেষ আলোটা যখন ওর সবুজ গা থেকে পালাল, বুঝলি, বুকটা যেন ধক্ করে উঠল! আমি সময়ের বিবেচনা না করেই মাগারেবে গেলাম। নামায শেষে তোদের কল্যাণ চেয়ে হাত ওঠালাম খোদার দরগায়।

'না, তবুও তোরা ফিরলি নে। এশার নামাযের সূরাগুলো তোর ঐ বন্দেমাতরমের হায়দারি হাঁকে কেবলই ভুল হতে লাগল। আমার চোখের পানি হাতের চেটোয়, জায়নামাযে... তোদের ভাইবোনেরা ভরসন্ধ্যেতেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিচের তলার চৌধুরীগিন্নী, ওদের মেয়ে ফুর্তি, নওয়াব মিঞা ভরসা দিয়ে নেমে গেল, আমি ঐ মহা বিপদের মাঝে কোরান শরীফের পাতা উল্টে চাঙা হওয়ার চেষ্টা করলুম— যিনি বিপদ দেন, তিনি তো বিপদ থেকে উদ্ধারও করেন।

কিন্তু, ও কি! আমাদের বাড়ির নিচেয় এত শোরগোল কেন! 'শ্লা, নেড়ে কুত্তারা নেবে আয়, ভেবেচিস তোদের সুয়ারহাড্ডি (তৎকালীন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী= সুরাবর্দী=সুয়ারহাড্ডি।) এসে রক্ষে করবে, সে গুড়েবালি। বানচোতদের একটাকেও

আস্ত রাখা হবে না। বলরে ভাই, বন্দেমাতরম!— এইসব জান-সেঁধনো কথাবার্তা শুনে আমি তোদের ভাইবোনদের আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকি। কিন্তু হঠাৎ কার বাজখাই গলার হাঁকডাকে হৈ-হল্লা সব খতম! কান পাতলুম, রাস্তার ধারের জানালার পাট সামান্য খুলে নিচের তাকালুম। ওমা! গলির আলোয় বন্দুক হাতে তোদের বিষ্টু কাকাকে দেখতে ভুল হলো না। ঐটুকু এক রত্তি লোক, কিন্তু জানিস খোকন, সে কি তেজ! দাঁড়ানোর সে কি ভঙ্গি, হাত নাড়ানোয় যেন রাজার হুকুম! কি বলছিল জানিস? বলছিল : এ বাড়ির ভেতর ঢুকেচ কি মরেচ। আর ধরো যদি ঢুকলেই, এই আমার লাশের ওপর দিয়েই তা ঘটবে। এখন কেটে পড় তো বাছাধনেরা।'

'তা কেটে পড়ল, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, আমাদের লাশ বানাবার ফিকিরে আসা গুণ্ডাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে গেল! দু-একজন তর্ক জুড়তে বসেছিল ঠিক, কিন্তু বিষ্টুবাবুর ঐ ভস্ম করে দেয়া তেজ সব যেন ভেস্তে দিলে। তেতলায় উঠে আমাকে বললেন, বৌদি, দেখলেন তা সব। বিপদ এখন ঘাড়ে। তবে আমি যদ্দিন বেঁচে আছি কুছ পরোয়া নেই। তবু সাবধানের মার নেই তো, আমি দোতলার চৌধুরী সাহেবকে আমার বন্দুকটা দিয়ে গেলাম। আর শুনুন, জামাকাপড় বাইরে শুকতে দেবেন না। আর কোরান একান্তই যদি পড়েন, মনে মনে, কিছুতেই শব্দ করে নয়। জানালাপাট সব বন্ধ! এ বাড়িতে মুসলমান কেন, কেউ নেই, এই ভাবটা যেন থাকে। ওরা আবার আসতে পারে, খুব সাবধান!'

'সত্যি সত্যি, ঐ গুণ্ডাগুলো আরো দু'বার এসেছিল। তোদের বিষ্টু কাকা প্রতিবার একা ঠেকিয়েছে আর কারু সম্পর্কে বলতে পারব না, তবে বিষ্টুবাবু যে বেহেশতে যাবেন, এ আমি হলপ করে বলতে পারিরে খোকন।'

'তবে কি জানিস বাবা, একটা খটকা থেকে গেল। ঐ যে, ওরা, খুনেরা যে মা-কালীর দিব্বি দিয়ে ভয় দেখিয়ে গেল তোদের বিষ্টু কাকাকে 'তোর জান নিয়ে ছাড়বো'। নেড়েদের জান বাঁচালি— 'তোদের জান কে বাঁচায় দেখে লিবো— তোর না পারি, তোর ছেলের লিবো'— এত বড় ভালো ঠেকছে নারে।'

মার সংশয় যে একদিন নিদারুণ সত্যি হয়ে দেখা দেবে কে ভাবতে পেরেছিল। মায়ের কাছেই শুনেছি। বিষ্টু বাবুদের ছিল এক সিনেমা হল ('ছায়া', না, 'টকি শো হাউক'?)। বিষ্টুবাবুর ছেলেকে একদিন ঐ খুনে গুণ্ডাগুলো, সিনেমা হলে তাঁর ঘরের দরজা বাইরে থেকে শেকল আটকে, পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে, দগ্ধে মেরেছিল।

বলতে হয়, এই আহুতি, কেবল আমাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সুস্থ মানবতার সপক্ষে আত্মবিসর্জন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাড়ি ফেরার আজ তৃতীয় দিন— ২২শে আগস্ট। গতকাল কোথাও বেরুই নি। এখানে তো আর থাকা সম্ভব নয়। বিষ্ণু কাকা আমাদের আর কতদিন সামলাবেন। কিন্তু মুসলিম পল্লীতে বাসা খুঁজবে কে? বড় ভাই কালকে চাচাকে বলে এসেছেন। কিন্তু ঠাঁই নেই কোথাও। চাচা পার্ক সার্কাসে আমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে জানিয়ে রেখেছেন, আর নিজে বৈঠকখানা অঞ্চলে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

শহর মোটামুটি শান্ত। তবে চোরাগোপ্তা ভুঁড়ি ফাঁসানোর কাজ থেমে নেই। বাড়িতে বসে সময় আর কাটে না। তাই একবার বৈঠকখানাটা ঘুরে আসব ঠিক করলাম, ঐসঙ্গে স্কুলের খবরটাও নেয়া হবে। বোনেদের ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। বড় ভাইয়ের সিটি কলেজও। মা আমার জেদের কথা জানেন, কাজেই ঘাট মানলেন। চাচা বাসার খোঁজ কতদূর কি করলেন এবং বাবার অপারেশন কবে হবে এসব তত্ত্ব নেয়ার উপদেশ দিয়ে হাতে একটা টাকা দিয়ে বললেন— ফেরার পথে কিছু আনাজ তরকারি নিয়ে আসিস। আর শোন, গোলমালের ধারেকাছে যাবি নে।'

বৈঠকখানা পৌঁছে প্রথমে সি.আই.ডি স্টাফ কোয়ার্টারে গেলাম লেনিনের খোঁজে। ওর বাবা পুলিশ দপ্তরে কাজ করেন। ও আমাকে দেখে বোকাই হয়ে গেল। ওর মা আমাকে খুব ক'রে ডেঁটে দিলেন আমার গোয়ার্তুমির কারণে। লেনিনের ওখানে না জমায় বেরিয়ে পড়লাম সতীর্থ আবদুলের বাড়ি। ওকে না পেয়ে ভাবলুম একবার স্কুলটা ঘুরে আসি। পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তে একটু ফাঁক করে দারোয়ান ছক্কুলাল জানালে, খোকাবাবু স্কুল বন্ধ আছে, বাড়ি চলিয়ে যাও।'

মির্জাপুরের[৪] যে কটা হিন্দু দোকান ছিল লুট হয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের একটি খোলা জায়গায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কাঁচা বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাজারের নাম— পাকিস্তান মার্কেট! এই বাজার গড়ার পেছনে দাঙ্গার ভূমিকাই প্রধান। এই এলাকার বাজার বলতে আগে ছিল বনেদি বৈঠকখানা বাজার। এটা আবার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়। ফলে মুসলমান হাটুরেদের ওখানে যাওয়া নাস্তি। প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠল বাজার : পাকিস্তান মার্কেট। এখানেই চাচাদের বাসা। ওঁর কাছে শুনলুম ২ সেপ্টেম্বর বাবার অস্ত্রোপচার করা হবে। পেপটিক আলসারে দীর্ঘদিন অসম্ভব যন্ত্রণায় ভুগছিলেন— এবার সব যন্ত্রণার হবে সমাপন। তবে অস্ত্রটা জটিল, তাই ভাববার বিষয় বটে। জানালের বাড়ির খোঁজ পাননি। অগত্যা বাজারে গিয়ে মায়ের দেয়া টাকাটার একটা হিল্লে করতে হয়। বাজার মানে মাছ-মাংসহীন বাজার। দেহাতি কিছু মুসলমান শ্যালদায় নেমে চলে আসে নতুন বাজারে— ঝুড়ি বোঝাই কিছু আনাজের

পশরা খুলে বসে। আর আনাজ বলতে নানা সাইজের বেগুন— বেঁটেবঙ্কু, লিকলিকে, ভুঁড়ো— ঢিপির মাকাল সব। আর কিছু রখো কাঁকরোল, শুকনো ডাঁটা। এই তো! কিন্তু উপায় কি, ঠোঙায় তাই নিয়ে সিধে বাড়ি।

আজ ২৩ আগস্ট। হঠাৎ করেই কলকাতা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছোরাছুরি খুব চলছে। শুনলাম পাঠানদের পাশে টমি সেনারাও মাঠে নেবেছে। দিনে রাতে সান্ধ্য-আইন জারি হয়েছে। একনাগাড়ে সাত দিন ঘরে বসে। নওয়াব কাকার সঙ্গে ক্যারাম নয়, লুডো নয়, দাবাও নয়— নিখাদ বাংলার নিজের খেলা 'ষোলো গুটি' খেলে এ'কটা দিন কাটিয়ে দিলুম। ২৯ আগস্ট ঈদের চাঁদ দেখা গেল কলকাতার ম্লান আকাশে। ছাতে উঠে তাই দেখলুম। কোনো হুল্লোড় নয়, কোনো ঘটারোল নয়। সান্ধ্য-আইনের চোখরাঙানি আমাদের সব আনন্দকে লুটে নিয়েছিল। আমরা ভাইবোনেরা নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে মায়ের কাছে এসে একে একে ঢিপ ঢিপ করে সালাম সারলুম।

অথচ 'কলকাতায় ঈদ মানে সাগর থেকে ফেরা যেনবা বানভাসি আনন্দভেলা! রমজানের চাঁদ যেদিন আকাশে উঁকি দিত সেদিন থেকেই চলত ঈদ নিয়ে যত জল্পনা। বাবার হাত ধরে ট্র্যামে চেপে ওয়াসেল মোল্লায় যাব, আমাদের দু'ভায়ের জন্যে হবে প্যান্ট-শার্ট, বোনেদের জন্যে ফ্রক রিবন, মায়ের জন্যে পমেটম আর মন্টুর গায়ে চড়বে রঙিন আঙিয়া, আর এই যে বাবার সঙ্গে যাওয়া হলো সে বাবদে পাওনা ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিম নেসলের চকোলেট!— এইসব আগাম ভাবনাতেও সুখ যেন লুকোচুরি খেলতো। হবে নাইবা কেন, আমাদের ছেলেবেলার আনন্দভুবনে ওয়াসেল মোল্লার ছিল মস্ত ভূমিকা— ওর সারা অঙ্গ জুড়ে ছিল যে গজমোতির রাঙা আলো আর ফুটফুটে সোনার কমল!.....

এরপর ভবিচরণ, রাদু ও বাটার কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফেরার তাগাদাও থাকত— 'ঈদের চাঁদ দেখতে হবে না? তাও কি কম মজা। কলকাতার মুসলিম পল্লীতে পল্লীতে বাড়ির ছাতে, মাঠে-ময়দানে, খোলা জায়গায় ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে চাঁদ দেখার যে ধুম পড়ত আশা করি প্রবাসী প্রাচীনেরা আজও তা ভোলেননি। চাঁদ দেখার পবিত্র কাজটি সমাধা হলো তো এবার 'আনন্দগান উঠুক তবে বাজি'।

'আহা কি আনন্দ! হৈ চৈ করতে করতে ছাতের সিঁড়ি ভেঙে ছুটতুম মায়ের চরণ ছোঁয়ার জন্যে— আশীর্বাদ জুটল তো হল্লা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। তারপর নতুন জুতো বুকে জড়িয়ে তার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘুমিয়ে পড়া।....'[৫]

কিন্তু এখন আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নিঝুমপুরী কলকাতার থেকে থেকে 'বন্দেমাতরম' এবং সুদূরের 'আল্লাহ-হু আকবর' ধ্বনি।

কাজেই ঈদে হর্ষনাদ বাতুল চিন্তাই বটে। তবে সান্ধ্য-আইনের কবলে পড়া ঈদ একটু ছাড় পেল— সকালে ছ'ঘণ্টার জন্যে তুলে নেয়া হলো কারফিউ। গ্যালিফ স্ট্রিট-এসপ্লানেড ট্র্যামে চেপে ময়দানে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ থেকে কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারেনি সেদিন। বড় ভাইয়ের মতো ডরকো নয়, ডাকাবুকোই ছিলুম বটে।

এমনি বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে কিংবা খেলা দেখতে ময়দানে যাওয়া আর ঈদের দিনে যাওয়া এক কথা নয়। অক্টারলোনি মনুমেন্টের আশেপাশের সবটাই জুড়ে দেড়-

দু'লাখ লোকের সমাবেশ— এর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মাঝে এক অনির্বচনীয় পুলক আছে বৈ কি। আমার বালক-মন কুৎসিত দাঙ্গাকে অতিক্রম করে আনন্দকে, সুন্দরকে ছুঁতে চেয়েছিল সেদিন। যারা দাঙ্গায় হাত পাকাচ্ছে, যারা অপরের প্রাণ হরণ করে আনন্দ পাচ্ছে, তাদের কাছে পরব কোনো অর্থবহন করে না— কারণ তাদের একটাই পরব— রক্ত নিয়ে হোলি খেলার পরব।

তথ্যপঞ্জি

১. বলতে ভুলেছি, আমাদের এই ৯০/১ বৈঠকখানা রোডের বাড়িটি দেশভাগের পর বিখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিনে নিয়ে নাকতলায় নবনির্মিত বাড়িতে উঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বাড়িতেই বাস করতেন। এ তথ্যটি প্রথম জানতে পারি ঔপন্যাসিক গজেনদার (মিত্র) কাছ থেকে। ১৯৮৯ সালে কর্মব্যপদেশে কলকাতা গেলে নবসজ্জিত বাড়িটি দেখার সুযোগ হয়েছিল।

২. আপার সার্কুলার রোড-বিবেকানন্দ রোডের মাথায় মানিকতলা বাজারকে টিট্ করবার জন্যে স্থানীয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি এই বাজারটি চালু করেছিলেন। দেখতে-শুনতে বাবু এই বাজারটি হতশ্রী পুরানো বাজারটিকে টিট করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়েছিল বড়— তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি ওটা।

৩. ইফতিখার আহমেদ। তখন সে পাঁচ-ছয় বছরের বালক। *সত্যের পরাজয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ'র* লেখক। রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য।

৪. পূরবী সিনেমার দিক থেকে শুরু করে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মির্জাপুর স্ট্রিট হিন্দু অধ্যুষিত। মিত্র স্কুল থেকে আমজাদিয়ার মোড় পর্যন্ত মুসলিম অঞ্চল। এখানে মুসলিম অঞ্চল সম্পর্কেই বলা হচ্ছে।

৫. *কমলালয়া কলকাতা :* মীজানুর রহমান, পৃ. ১৩৭, ১৪১।

উপসংহার

যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল বাড়ি পাওয়া যে ততটা সহজ কাজ নয়, তা বোঝা গেল অচিরেই। ভবানীপুরে, শ্যামবাজারে, বেহালায় এবং এমনি আরো কিছু হিন্দু অধ্যুষিত পল্লীর ফাঁকে ফোকরে যেসব মুসলিম পরিবার বাস করত, তারা এসে জড়ো হচ্ছিল পার্কসার্কাস, তালতলা, ওয়েলেসলি, বৈঠকখানা, নারকেলডাঙা, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ— এমনি সব মুসলিম পল্লীতে। টাপেটোপে উপচে পড়ছিল এলাকাগুলো। চিলেকোঠা, ভাঁড়ার ঘর, বসার ঘর, এমন-কি আলসে বারান্দাগুলো পর্যন্ত ধড়াধ্বড় ভাড়াটেদের দখলে চলে গেল। চাচার দ্বারা হলো না— যিনি ভাববেন তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস হাসপাতালে শয্যাশায়ী, অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায়। কাজেই আমাদের পা পেতে বসার একটা হিল্লে হলো না। আমার দিক থেকে কোনো তাড়া ছিল না, আমার মুকুল ফৌজ ছিল, ডানহাম মেডিক্যাল কলেজে দাঙ্গায় আহতদের সেবায় সেবকের ভূমিকা ছিল, আর ঐ যে কাঁচাবয়েসের দস্যিপনা— এসব তো ছিল; কাজেই এত বড় যে একটা দাঙ্গা হয়ে গেল, যার জের এখনও চলছে এবং বাস করছি গড়পারের গুণ্ডাদের তোপের মুখে, এসবের তোয়াক্কা আমি করলে তো। কিন্তু মা-র চোখে ঘুম নেই, বিষ্ণু কাকার অভয়বাণীও তার দুশ্চিন্তাকে রুখতে পারে না। যেদিন সুভালাভালি বাবার অস্ত্রোপচার হয়ে গেল, সেদিনই ঘটল এক কাণ্ড— ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের টোপটা গিলে ফেলল কংগ্রেস। জওহরলাল ও তাঁর তেরোজন সহকর্মী অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে বসলেন লীগকে সহযোগী না করেই। এতে লীগের সমর্থকরা কালো পতাকা উড়িয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করল।[১] আমার ২রা সেপ্টেম্বরের ডায়েরিতে এভাবে লেখা আছে— 'হিন্দুদের বাড়িতে কংগ্রেস flag ও মুসলমানদের বাড়িতে কালো পতাকা।'

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের মতোই থমথমে কলকাতা। একটা কিছু ঘটবে, ঘটতে যাচ্ছে এমন একটা আশঙ্কা সবার মনে। আমাদের আশেপাশের বাড়িগুলোতে কংগ্রেসের পতাকাগুলো সগর্বে উড়ছিল। ইংরেজ সরকার বিপদ আঁচ করে শহরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। ভারতীয় সেনাদের পাশাপাশি টমি সেনারা মিলিটারি লরি ও ট্যাঙ্কযোগে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। বেলমুক্তা কলকাতা একটা জঙ্গি চেহারা নিয়েছিল। এর উপর আজ ২রা সেপ্টেম্বর আবার বাবার অস্ত্রোপচারের দিন। মাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। ছাত থেকে শহরটাকে জরিপ করার পর বাইরে যাবার একটা ছুতো খুঁজছিলাম।

'আজ তো বাবার অপারেশন। হাসপাতালে যাই মা?' এমন একটা প্রস্তাব মা যেন প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু উপস্থিত কোনো অভিভাবক না থাকায় তা পূরণের আশু

সম্ভাবনা না দেখে মায়ের কি উষিমুষি— ঘরবার করতে করতে উচক্কা এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তবে সঙ্গে যাবেন বড় ভাই।

প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা লেগেছিল অস্ত্রোপচারে। সেকালের শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থার নিরিখে মস্তো বড় ঘটনা। আন্ত্রিক ও নাড়ির গোলযোগ এবং পাকস্থালীতে ঘা। সার্জনের নাম মনে নেই, তাঁর হাতযশের পরিচয় পেলাম যখন হাসিমুখে ওটি থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি।

না, যেমনটা আশা করা গিয়েছিল তেমন কিছু ঘটেনি। চাপা উত্তেজনার মধ্যেই দিনটা কেটে গেল। তবে দাঙ্গায় বোম্বেতে ৯০ জন মারা গেছে এমন একটা সংবাদ ডায়েরিতে পেলাম। বোম্বাই যে দাঙ্গাপ্রবণ শহর, আজও ধরে রাখতে পেরেছে তার সেই ঐতিহ্য। শিবসেনার শহর বলে কথা। ১৭ অক্টোবরের ডায়েরিতে নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গায় ১০০ জনের নিহত হওয়ার খবরও রয়েছে। বোধ করি এরই জের হিসেবে বিহারে দাঙ্গা বাধে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমার ১৯৪৬ সনের ডায়েরির (ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) প্রায় প্রতিদিনের বর্ণনায় বোম্বাই ও কলকাতার দাঙ্গার বিবরণের পাশাপাশি বহু লোকের হতাহতের সংখ্যা রয়েছে দেখতে পাই। মাঝে মাঝে ঢাকা ও বিহারের ছাপরা ও পাটনার উল্লেখও রয়েছে।

১লা নভেম্বরের দিনলিপিতে শুধু ছাপরা জেলাতেই ২০০০ লোক দাঙ্গায় মারা গেছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এ সংখ্যা ১০ নভেম্বরে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩,০০০ হাজারে! মতান্তরে এক লাখ! বিহার শরিফসহ বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পাঁচ দিন ভালোয় ভালোয় কাটলেও ৬ সেপ্টেম্বর গুজব রটে গেল আবার দাঙ্গা বেধে গেছে। গুজবের শক্তি ভয়ানক। বেশ কয়েকটি এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ৫ জন নিহত ১০ জন আহত হয়। এর মধ্যে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ আহুত Committee of Action Day পালিত হয়ে গেল ৮ সেপ্টেম্বর। গোলমাল তীব্র আকার ধারণ করার কথা ছিল। সেরকম কিছু না ঘটলেও এরপর আর শান্ত হয়নি কলকাতা ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ পর্যন্ত। থেমে থেমে চোরাগোপ্তা হামলা লেগেই ছিল। আশ্চর্য, অস্বাভাবিক কলকাতায় তাই বলে স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকেনি। সুস্থ হওয়ার পর বাবা নিয়মিত অফিস করেছেন (তখন তিনি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত লেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সচিব), হাটবাজার হয়েছে, স্কুল-কলেজও কামাই হয়নি। বোম্বাইয়ে তো গড়ে প্রতিদিন সিকি শতাধিক লোক হতাহত হচ্ছে।

কলকাতার দাঙ্গাকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ক্ষুব্ধ ছিল গোড়া থেকেই। লালবাজারে বসে পাঠান সেনা নামিয়ে দাঙ্গায় পক্ষপাতিত্বের কলকাঠি নেড়েছেন তিনি এমন অভিযোগ তাদের। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে তা ১৩১-৮৭ ভোটে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাবটি ১৩০-৮৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[২]

এতদিন দাঙ্গাটা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বরের দিনলিপিতে দেখছি শিখদের উপস্থিতি। হিন্দুদের পাশে শিখেরাও দাঁড়িয়েছে এবং তাদের কৃপাণের ঘায়ে তিনজন হতাহত হওয়ার পাশাপাশি একজন শিখের আহত

হওয়ার বিবরণও পাই। আর যে ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী আমি সেদিনটা ছিল ২৫ অক্টোবর। আমরা মুকুলেরা ডানহামে দাঙ্গায় আহতদের সেবা করতুম। প্রত্যেকের ডিউটির সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। আমার ছিল দুপুর দুটো থেকে তিনটে। কিন্তু যথাসময়ে যাওয়া হয়নি বলে বিকেলে মার শত নিষেধ সত্ত্বেও (কারণ সেদিন দাঙ্গার রূপটা ছিল ভয়ঙ্কর) আমি সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লাম। লেনিনকে ওদের বাসা থেকে ডেকে নিয়ে বেরিয়েছি ডানহামে যাব বলে, কেশব সেন স্ট্রিটে (মেছোবাজার) ঘটল এক বীভৎস কাণ্ড। রাজাবাজার-সার্কুলার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে একটা যাত্রীবাহী ট্যাক্সি ছুটে আসছিল ঠনঠনের দিকে যাবে বলে। হঠাৎ 'শালা শিখ কো মারো... মারো' ধ্বনি এবং যুগপৎ মুষলধারে ঢিল-পাটকেল বর্ষণ ঐ ট্যাক্সি লক্ষ্য করে। শিখেরা গোড়ায় মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, পরে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু গত মাসে হঠাৎ করেই নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। ড্রাইভার হিসেবে শিখদের আধিপত্যের কথা কে না জানে— আর ওদের পাগড়ি ওদের শনাক্ত করতে ধাঁধায় ফেলে না কাউকে। ট্যাক্সির শিখ ড্রাইভার বোধকরি শর্টকাটের ফাঁদে পড়ে ঝুঁকিটা নিয়েছিল। ফুল স্পীডে গাড়ি চালিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারল না। শিখ ড্রাইভারের মাথায়-চোখেমুখে ঢিল পড়তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাক্সিটা ফুটপাতে চড়াও হয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টে প্রচণ্ড আঘাত হেনে মুখ থুবড়ে পড়ল। স্টিয়ারিং হুইল ড্রাইভারের বুকে পাষাণের মতো চেপে বসলে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। সামনে পেছনে গাদাগাদি করে বসেছিল ছ'জন আরোহী— কারো মাথায়, কারো হাতে-পায়ে-মুখে জখম আর রক্ত। এই আহত আরোহীদের ওপর চড়াও হবার আগেই গুর্খা সেনাবাহিনীর একটি টহল দল এসে উপস্থিত। ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছিল। লেনিনটা দৌড়ে পালাল। আমি একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ি আসন্ন বিপদ বুঝে। একটা বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম— অন্তঃপুরে স্থান হলো। অবশেষে সুনসান বুঝে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি বস্তিরবাসী মুসলমানেরা গোলাগুলির তোয়াক্কা না করে মহরমের জন্য তুলে রাখা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নেচেকুঁদে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সবাইকে উন্মত্তই মনে হলো আমার। একেই বোধ হয় ধর্মোন্মাদনা বলে। তলোয়ার ঘুরিয়ে 'লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও 'আল্লাহ হো আকবর' ধ্বনি তুলছিল। সেনাদল বস্তির ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। একজন গুর্খা সেনা রাইফেলটা মাটিতে ঠেকিয়ে এটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লোক ঐ গুর্খাকে আক্রমণ করে বসল এবং পলকের মধ্যে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল এক অন্ধগলির ধাঁধায়! গুর্খা সেনাটি তলোয়ারের ঘায়ে রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল! এমন সময় টহল পুলিশের আরেকটি দল এসে উপস্থিত। বন্দুকের নলগুলো গর্জে উঠল— তিনজন ছিটকে পড়ল রাজপথে। এসব দেখে গলিতে আবার লুকানো। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু ঠাণ্ডা হলে কেশবে পড়ে দেখি পুলিশ ও সেনাদের অসংখ্য গাড়ি আর গাড়ি। জায়গাটিকে রণক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু মনে হলো না। অদূরে মুখ থুবড়ে পড়া ট্যাক্সি থেকে প্রথমে দুজন আহত মহিলাকে এবং পরে আরো দু'তিনজনকে সেনাদের সাহায্যে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

ডানহামে আর যাওয়া হয়নি সেদিন। ঘোরাপথে নিরাপদ এলাকা ধরে বাড়ি ফিরে আসি।

মুকুল ফৌজও দাঙ্গা পীড়িতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একথা আগেই বলেছি। বাগবান ভাই (মোহাম্মদ মোদাব্বের) ও কামরুল ভাইয়ের নেতৃত্বে রেডক্রসের সহযোগিতায় আপার সার্কুলার রোডের ডানহাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ভবনে (হিন্দু পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বিধায় পরিত্যাক্ত) আমাদের কার্যালয় গড়ে ওঠে। প্রতিদিন নিয়ম করে প্রথমে ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের নড়বড়ে 'আজাদ' অফিসে (স্বাধীনতা উত্তরকালে যা দৈনিক 'লোকসেবক' এর কার্যালয় হয়) যেতে হতো বাগবান ভাই ও কামরুল ভাইয়ের কাছে,— জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পীড়িতদের সেবার আদর্শে দীক্ষা ও পরামর্শ নেয়ার জন্যে। মুকুল ফৌজের সদস্য ছাড়া বাইরে থেকেও কিছু সদস্য নেয়া হয়েছিল। আমার 'আত্মজীবনী' তথা ডায়েরির পাতায় বেশ কিছু নাম উলেখ রয়েছে দেখতে পাই : জাফর, লেনিন, খুরশিদ, আমজাদ, মোশাররফ, কাজী মসিউর, মতি ও সেক্রেটারি বাসার। আমরা যে শুধু আহতদের সেবা করতাম তা নয়, বিহারে মহাদাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ভাগ্যাহত মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে মুকুল ফৌজ কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে সে বিষয়েও কয়েক দিন আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিহার রিলিফ ফান্ড'।[৩] আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয় একটি করে দানবাক্স। অর্থের পাশাপাশি চাল সংগ্রহেরও নির্দেশ ছিল। ট্রামে-বাসে এবং বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহে মেতে উঠি। ভারি চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়। সবাই জানে বিহার রিলিফ ফান্ড ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান পরিবারদের সাহায্যের জন্যেই গঠিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, পীড়িতদের যে কোনো জাতি-ধর্ম নেই তা ট্রাম-বাসের সজ্জন হিন্দু যাত্রীরাও উপলব্ধি করেই অকাতরে দান করেছিলেন এই ফান্ডে। আমার বালক-মনে এর সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল একথা বলাই বাহুল্য। মোট কত টাকা ও চাল সংগ্রহ করেছিলাম মনে নেই, তবে ১৯/১১/৪৬ দিনলিপিতে লেখা আছে 'আমি এ পর্যন্ত বিহার রিলিফ ফান্ডে ৫৪ উঠাইয়াছি।... ৩১ সের চালও উঠাইয়া দেই।' ১৫ই ডিসেম্বর 'আজাদ' পত্রিকায় বিহার রিলিফ ফান্ডে সর্বোচ্চ অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রাহক হিসাবে লেনিন ও আমার নাম ঘোষিত হয়, এতে আমরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্থানটা আমার অধিকারেই ছিল। কিন্তু লেনিনের এক শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় দানবাক্সে জমা দেয়ার শেষ দিনে নির্দিষ্ট সময়ের পরে এক থোক টাকা ফেলে শেষ পর্যন্ত আমাকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেয়।[৪]

ফান্ড তোলার কাজের পাশে ডানহামের কাজটাও চলত। সারাদিন ট্রামে-বাসে ঘুরে বাড়িতে দুটো খেয়েই ডানহামে ছোটা। একজন ডাক্তার আমাদরে ফার্স্ট এইডের সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দেন। কিভাবে স্পিরিট দিয়ে ক্ষত ধুতে হবে, আয়োডিন দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে এসব তো শেখানো হতোই, স্ট্রেচারে আহতকে কিভাবে শোয়ানো হবে এবং বহন করতে হবে এসবের শিক্ষাও চলত। একবার আমজাদিয়া-র[৫] কাছে এক দেহাতি হিন্দু পথচারী ছুরিকাহত হলে দৌড়ে গেলাম আমি ও লেনিন। ট্রাম লাইনের উপর ছটফট করছে লোকটা— পেটটা হা হয়ে আছে! বীভৎস দৃশ্য। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটা নাইচে

রক্তের বন্যায়। তলপেট বেয়ে গল গল করে নাবছে রক্তের ধারা— ভদ্রলোক অস্ফুটে বলেই চলেছেন, 'আমাকে বাঁচাও বাবারা, আমাকে বাঁচাও.....' আমরা হতভম্ব। এরকম মারাত্মক জখমের সম্মুখীন হইনি এর আগে কখনো। স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে ডানহামে নিয়ে এসেই ক্যামবেল ও মেডিক্যাল হাসপাতালে ফোন করলাম অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্যে। এই জখম ফার্স্ট এইডে কুলোবে না। আমরা পেটের ক্ষতমুখটা ব্যান্ডেজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরে রক্ত ওগলানোটা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভদ্রলোকের আর বাঁচা হলো না। আজও ওঁর 'আমাকে বাঁচাও বাবারা' কানে এসে বাজে। কার স্বামী, কার পুত্র ভাই কি বাবা, জানি নে— অপরাধ বোধটা রয়েই গেল। চিকিৎসাটা হলে কিছুটা শান্তি পেতাম।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর জুড়ে ডায়েরির পাতায় পাতায় দেখছি আজাদ কার্যালয়ে মুকুলের মহফিলের দফতরে যাওয়া-আসার বিবরণ। বাগবান ভাই ও কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা চলে এসময়। শুধু যে দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যের আলাপ হতো তা নয়, এর সঙ্গে রাজনৈতিক-সংলাপও চলত। কেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগ যোগ দিল না, টিপু সুলতান দিবস, সিরাজ দিবসের তাৎপর্য কি, পাকিস্তান আন্দোলন কেন জরুরি— এসব। প্রয়োজনে ডানহামেও আসতেন ওঁরা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে জিন্না সাহেবের কলকাতা আগমন উপলক্ষে মুকুল ফৌজের গার্ড অব অনার দেয়া। সর্বাধিনায়ক কামরুল ভাই আমাদের মার্চ পাস্ট করান। এই সুশৃঙ্খল ফৌজের কর্ণধার বাগবান ভাইয়ের ডাক পড়েছিল মঞ্চে। জিন্না সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করেছিলেন বাগবান ভাইয়ের সঙ্গে। পাকিস্তান আন্দোলনে মুকুল ফৌজের অবদান বড় কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও প্রচার সচিব হবিবুলাহ্ বাহারের কথাও মনে পড়ে। ওঁর ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটের (নাকি সার্পেনটাইন লেন?) বাড়িতে যেতাম পোস্টার ও লিফলেট আনার জন্যে— মুকুলদের মাধ্যমে পাকিস্তান আন্দোলনের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্যে।

কিন্তু দাঙ্গা যে থামে না। বরং চোরাগোপ্তা হামলা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থার মাঝেই হাসপাতালে ফাঁক পেলেই বাবাকে দেখে আসছি, স্কুল খুলবে কিনা তার খোঁজখবর নিচ্ছি, দু'ভায়েতে মিলে বাজারের কাজটাও সারছি। দাঙ্গার প্রকোপটা বেশি হলে প্রতিবেশীরা তো রয়েছেনই। মনে পড়ে উমা-বুয়াদের সৎ মাকে। এই পুণ্যকর্মা মহিলা সৎ শব্দটাকে উৎখাত করে প্রকৃতই ছিলেন উমা-বুয়াদের মা-আমাদের মাসিমা। গড়পারের ঐসব খুনে-লুটেরাদের ভ্রুকুটি দেখিয়ে আমাদের ঐ মহাবিপৎকালে সাহায্যের মস্তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যখনই ঘটত গৃহবন্দির জীবন, জানালা দিয়ে উমাদের বাড়ি ছুঁড়ে মারতেন মা দেশলাইয়ের বাক্স— ওর ভেতরে থাকত বাজারের টাকা ও টোকফর্দ। মাসিমাদের চৈতনধারী ঠাকুর সেই ফর্দ মিলিয়ে বাজার করে নিয়ে আসত। পুলিশের[৬] সাহায্যে ঠাকুর বাজারের থলেটা সহজেই পৌঁছে দিত আমাদের। পুলিশ উঠে গেলে তেতলা থেকে দড়ি নাবিয়ে দেওয়া হতো নিচে— দড়িতে বাঁধা পড়লে অবলীলায় উঠে আসত থলে। হবে না, এ যে মা-মাসিমার রাখীবন্ধন।

প্রাণের ভয় মাসিমারও কম ছিল না, হিন্দু হয়ে মুসলমানদের সাহায্য করা বলে কথা— কিন্তু যুগে যুগে এমন প্রাতঃস্মরণীয়া বিষ্টু কাকা ও মাসিমারা আবির্ভূত হন বলেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়, ভারি পীড়া দেয় এ উপমহাদেশের মহা অসদাচারণ।

ডানহামের পাশাপাশি রেডক্রসের আঞ্চলিক দফতরেও ডিউটি দিই এবং দাঙ্গার কারণে অসহায় লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এদের খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে সাহায্যের জন্যে রাজাবাজার এলাকার ১০ নং রাণী স্বর্ণময়ী রোডে অবস্থিত রিলিফ সেন্টারে যেতে হতো। স্মৃতির পাতায় এসব ধূসর হয়ে গিয়েছিল, ডায়েরির কীটদষ্ট সজীব পাতাগুলো আমায় সেকালে ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করছে বৈকি।

অস্ত্রোপচারের পর ৫ই অক্টোবর প্রথমবারের মতো বাবার হাঁটাহাঁটির শক্তি ফিরে পাওয়ার তথ্যের পাশাপাশি ভূপালে জিন্না-নেহরুর সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী শান্তি-আলোচনা অনুষ্ঠানের খবরও পাই। খবর পাই নোয়াখালিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার এবং ১৭ অক্টোবরে ১০০ জন নিহত হওয়ার দুঃসংবাদসহ বিহারে ১৩০০০ নিহতের এবং ৫০,০০০ আহতের সংবাদ। ২৬শে সেপ্টেম্বর লীগ সদস্যেরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়ার ফলে অবস্থার উন্নতি হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু গদি দখলেই তারা ব্যস্ত রইলেন। অর্থ মন্ত্রীর পদ ছাড়া প্রধান মন্ত্রীসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ কংগ্রেসের তাঁবে গেলেও লিয়াকত আলী অর্থ নিয়ে অনর্থ ঘটিয়ে শাসন ব্যবস্থার ঘুম হারাম করে দিলেন। ওদিকে ডায়েরির পাতায় দেখছি আমার বালকসুলভ আচরণের উপাখ্যান। দৈনিক *স্টেটস্‌ম্যান*-এর Benji League (সদস্য নং ৮৩২৩৯), *আজাদ*-এর মুকুলের মহফিল (সদস্য নং. ৮৩৩৯), *মর্নিং নিউজ*-এর Our Young Folks League, *স্টার অব ইন্ডিয়া*-র Childrens Citizen Junior Club, *শিশু সওগাত*-এর শিশু মহল, *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর মিতালী মজলিস (সদস্য নং. ৪১) প্রভৃতি পত্রপত্রিকার ছোটদের বিভাগগুলোয় আমার যোগদানের খবরাখবর। মর্নিং নিউজ, আজাদ ও ইত্তেহাদে আমার কার্টুন ছাপার সুসংবাদ। ধর্মতলায় জে.সি. লাহাদের দোকান থেকে রং-তুলি ও ড্রয়িং খাতা কেনার পাশাপাশি কার্টুন পত্রিকা Hey Day ও Punch কেনা এবং বোনদের নিয়ে মেট্রো-তে Courage of Lassie (৩-১২-৪৬) দেখার আনন্দ সংবাদও রয়েছে।

নভেম্বরের পয়লা তারিখে বৈঠকখানার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আমাদের একটা গতি হলো শেষ পর্যন্ত। বিষ্টু কাকা মাসিমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা উঠে গেলাম ঐ অঞ্চলে। কিন্তু এক বাড়িতে আমাদের ঠাঁই হলো না। তিরিশ ও চল্লিশের প্রথম পাদে যে বাড়িতে দীর্ঘকাল কেটেছিল, সেই ১০/সি পাটোয়ার বাগানের লাগোয়া ১০/বি-তে' মা আমাদের ছয় বোন ও ছোট ভাইটাকে নিয়ে আধখানা সংসার পাতলেন দোতলার ছোট্ট, এক কামরাতে। আর বাবা, বড় ভাই ও আমি নানা ঘটনার সাক্ষী অভয়-ভবন— ৯০/১ বৈঠকখানা রোডের মেসবাড়িতে গিয়ে উঠলুম। এই বাড়ি-আক্রার সময় জোড়াতালির এই ব্যবস্থা যে হলো সেটাই মস্তো কথা। খাবার সময় হলেই ছোট মায়ের কাছে দুপুরে আর রাতে। খাও রেশনের কাঁকরে মেশানো ভাত, নিঃশব্দে না চিবিয়ে, পাছে দাঁতের সঙ্গে কোলাকুলি হয়! সাত দিনের মাথায় ঘটল এক কাণ্ড। চোরেরা যে দুধও পান করে তামাকুও সেবন করে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে আমাদের মেসবাড়িটাকেই নির্দিষ্ট

করল— দাঙ্গায় লুটপাটের বখরায় মন্দা পড়ে থাকবে হয়তো, তাই তালা ভেঙে যা পারো তাই নাও! দুপুরের খাবার সেরে মেসবাড়ি ফিরেছি দেখি দরজা হাট করে খোলা! দুটো তালা লাগানো ছিল, একটা তালা উধাও, আরেকটা তালা মেঝেয় পড়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখি সারিবদ্ধ তক্তপোষের সনাতন চেহারা আর নেই— সব লণ্ডভণ্ড একাকার! সতরঞ্চি, বিছানার চাদর অদৃশ্য, মেঝেয় তক্তপোষের ওপর ছাপোষা কেরানিকুলের তোরঙ্গ সুটকেস ভাঙ্গা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লতিফ ভাইয়ের ২৬৬ টাকা ৩ আনাসহ একটা পাঞ্জাবি ও একটা শার্ট নেই তো মতি ভাইয়ের ধুতি ও ঘড়ি লোপাট! সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ভৃত্য লোকমানের— ওর সবেধন সুটকেসটাই হাওয়া।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর যে ঈদ চলে গেল তার কথা তো বলিনি। গত ঈদে আপার সার্কুলার রোডে গড়পারের বাড়িতে ঈদের কোনো আনন্দ-উৎসব না হলেও, এবার কিন্তু ঈদটা জমলো ভালো— দাঙ্গার মধ্যেও। ঠিক আগের মতোই ঈদের চাঁদ দেখার ধুম পড়ে গিয়েছিল, ঘটা করে মাকে সালাম করাও হলো। ঈদের দিন উভয়পক্ষের দাঙ্গাবাজেরা যার যার ছোরা কোমরেই গুঁজে রাখল। ফলে টিকিট কেটে ট্র্যামে করে শহরটা বেড়ানো গেল। লেনিনদের বাড়ি কিছু খেলাম, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা কোলাকুলি করা এসব হলো। প্যারামাউন্ট সিনেমা হলে অনেকদিন পরে ছবি দেখলাম-খুরশিদ ও করণ দেওয়ান অভিনীত 'রতন'।[৮]

প্রতিদিন নিয়ম করে স্কুলে যাই, গেট থেকে দারোয়ান ছক্কুলাল ও কিষেণের 'আজ ভি ইস্কুল খোলে নাই' এই তোতাপাখির বুলি শুনে বাড়ি ফিরি। কিন্তু ১০ই নভেম্বর শুনলাম অন্য কথা— ১১ই খুলবে।

কিযে আনন্দ হয়েছিল শুনে। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম স্কুলে না গিয়ে-গিয়ে, সুনীতি-গগন-অজিতদের সান্নিধ্য না পেয়ে পেয়ে।

কিন্তু বাধ সাধলো বৃষ্টি। ধরলে, দেরি করে হলেও স্কুলে গেলাম। আজ ফটক খোলাই পেলাম, ছক্কুলাল বাধা দিলে না। তবে কিনা সারা স্কুল জুড়ে মাত্র কয়েকজন ছাত্র। ক্লাস না হয়েই ছুটি হয়ে গেল। ১২ই কিন্তু ফাঁকি দিলে না। তো স্কুলভবন যেমন ছিল তেমনি আছে, মৌলবী স্যারের ছোট ক্লাসরুমটি বাদে। ঘরের চার দেয়ালে, স্যারের অমসৃণ নড়বড়ে টেবিলের গায়ে, খড়িমাটি দিয়ে কে বা কারা ঘোর সাম্প্রদায়িক শ্লোগানের আদ্যশ্রাদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ 'নেড়েরা নিপাত যাও' 'রক্তের বদলে রক্ত চাই' 'ফাঁকিস্তান চাও? খেজুরের দেশে যাও'— এইসব আপাত নিরীহ বাক্যসমূহ যত্রতত্র তরঙ্গায়িত চিত্তে নেত্য করছিল! বিষণ্ন মনে নিজের ক্লাসে ফিরে গেলাম।

ক্লাসে ঢুকে সে আরেক অভিজ্ঞতা : হিন্দু ছেলেরা বসবে না মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে— এমন কি হতভাগা প্রাণের বন্ধু সুনীতি গগনও নয়। ক্লাসের ডান দিকে প্রথম সারিতে একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চে আমরা ছ'জন। এক ঘর ক্লাসেও কেন নিঃসঙ্গ ঠেকল নিজেকে। মগজের শয়তানগুলো ভাব জমাতে চায়। প্রকৃত অর্থে আমরা সবাই পিশাচী রাজনীতির শিকার। দু'ক্লাস পরে থার্ড পিরিয়ডে কৃষ্ণদয়াল বাবুর ক্লাস। যথাবিহিত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। অনেক দিন পরে ঊর্ধ্বাঙ্গ শুভ্র চাদরে মোড়া স্যারকে দেখে পুলক অনুভব হলো। মনে হলো ওঁর চারধারে চক্রাকারে শুভ্র আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে—

মৌলবী স্যারের ক্লাসরুমটির তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং নিঃসঙ্গতা নিমেষে দূর হয়ে গেল। একটু আলো-বাতাস খেলল ঘরে, একটু নিরাপত্তা। সুনীতি গগনেরা আরো একটু কাছে।

হত্যাযজ্ঞের দুর্যোগময় দিনগুলো কে কিভাবে কাটালুম, ক্ষয়-ক্ষতিই বা কার কেমন হলো, কৃষ্ণদয়াল বাবু ধীরেসুস্থে জেনে নিচ্ছিলেন।

— মীজানুর, তোর কি খবররে? চুপচাপ যে বড়ো?

আচমকা স্যারের প্রশ্নে উঠে পড়ে বললাম— -সে তো অনেক কথা স্যার।

— ছোট্ট করে বল্। তোরা তো আবার গড়পারায় থাকিস। খুলে বল।' রোলগোল্ডের রিমলেস চশমাটি চোখ থেকে নামিয়ে গায়ের চাদরে মুছে নিয়ে বললেন কেষ্ট বাবু।

— স্যার, প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ঐ বিষ্টু বাবুর কৃপায় স্যার।' এরপর কি অদ্ভুত উপায়ে আমাদের গোটা পরিবারটাই বেঁচে যায় কৃষ্ণদয়াল বাবুকে সব খুলে বলে যোগ করলুম— কিন্তু স্যার, ষোলই আগস্টের সকালেই কিন্তু আমার হয়ে গিস্‌ল।

চশমা কানে ঠিক মতো বসিয়ে বুঝিবা একটু চমকে— কেমন?

— হকার তো প্রতিদিন খুব ভোরবেলাই, হাইড্র্যান্ট থেকে উড়েদের জল দেয়ার পর পরই কাগজ দিয়ে যায়— ঐদিন একেবারে না। বড় ভাই বললে, যা না, মানিকতলায় মোড় থেকে একটা অমৃতবাজার নিয়ে আয় না। ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো।' একটা মস্তো কাস্তে-হাতুড়ির শান্তি মিছিল পার করে মানিকতলার মোড়ে গিয়েছি কি অ্যাব্বড়ো সব ঢিল স্যার, একেবারে টমিগুলোর বুলেটের মতো.....

— ছুঁড়ছিল কারা বল্?' কৃষ্ণদয়াল বাবুর উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

ক্লাসের সবাই আমার দিকে অধীর আগ্রহে।

— মানিকতলার দিক থেকে মুসলমানেরা আর বিবেকানন্দ রোডের ওপাশ থেকে হিন্দুরা স্যার। বাজার, দোকানপাট সব বন্ধ— হকার নেই, কাগজের ভরসা আর কি করে করি। তবে কিনা, একটা মিষ্টির দোকান, খোলা ছিল না, কে জোর করে খুলেছে জানিনে, ধুম্‌সে লুট হচ্ছিল। মানে ঐ রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, বোঁদে এ সব আর কি.....

— তুই কি করলি?' মিষ্টি লুটের কথায় কেষ্ট বাবুও মিষ্টি করে নীরবে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

— আমি তো স্যার থ! ওদিকে ইঁটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি তো এদিকে চেকদার লুঙ্গির কোঁচড়ে রসগোল্লা পাতুয়ার গড়াগড়ি! আমি স্যার বিপদ বুঝে মানিকতলার দিকে সটকে পড়লাম। কিন্তু বিপদ স্যার যখন আসে তখন সব দিক থেকেই আসে।'

— কেনরে হতভাগা, তুই তো মুসলমান পাড়াতেই ঢুকলি! কেষ্ট বাবুর বিস্ময়।

— ঠিক স্যার, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন ওপাড়ার অলিগলিগুলো আবার হিন্দু-মুসলমানে মেশামেশি স্যার। মানে একটা গলি হিন্দু তো পরের গলিটাই হলো মুসলমানদের। হাঙ্গামার মাঝে পড়ে ওসব খেয়াল করিনি নিশ্চিন্ত মনে রঙ্গ দেখছিলাম।

— রঙ্গ!

— হ্যাঁ স্যার, রঙ্গ নয় তো কি? এদিকে রক্তারক্তি কাণ্ড তো ওদিকে সন্দেশ পান্তুয়ার লোফালুফি— আপনি বলুন স্যার, রঙ্গ নয়?

কৃষ্ণদয়াল বাবুর সারা মুখে আল্‌তো মিষ্টি হাসি প্রলম্বিত। সঞ্চারিত ক্লাসেও।

— তো রঙ্গ দেখচি, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই উচক্কা পেছন থেকে কে মারলে এক বেদম মার— এই এখানে স্যার। আমি কঁকিয়ে বসে পড়ে পেছনে তাকিয়েছি কি দেখলুম ব্যাটাচ্ছেলে এক উটকো বজ্জাত হাসতে হাসতে সড়কি হাতে হিন্দু পাড়ার দিকে ছুটছে! ভাবলুম পা-টা আস্ত আছে তো, নাকি গেছে! এই দেখুন স্যার, রক্ত জমাট হয়ে জায়গাটা সিঁদুরের মতো গোল হয়ে আছে।' বলেই হাফ প্যান্টের কিছু অংশ সরিয়ে উরুদেশটা দেখালুম।

কৃষ্ণদয়াল বাবু এবার নীরবে নয়, বেশ সরবেই হেসে উঠলেন, বললেন— মীজানুর, তোর পার্টটা দেখচি মৃত সৈনিকের— বিনি কারণে পড়ে পড়ে মার খেলি।' কথা শেষ করেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গাঢ় স্বরে যোগ করলেন— ঈশ্বর তোদের জন্যে শুধু 'বিষ্ণু'কে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বিপদের ঘাটে ঘাটে তিনিও ছিলেন।

এরই মধ্যে আমার আঁকাউকির কাজ চলছে। দাঙ্গা আমার বিনোদনকে কেড়ে নিতে পারেনি। ৩/১২/৪৬ তারিখে মর্নিং নিউজে আমার আঁকা প্রথম কার্টুন ছবি ছাপা হয়ে বেরিয়েছে এ সংবাদ পাই। ছবি ছাপার উৎসাহে ৪/১২/৪৬ তারিখে ধর্মতলার লাহাদের দোকান থেকে রং ও তুলি কিনে নিয়ে আসি এবং "এদিন থেকেই আমি রং ও তুলির ব্যবহার করতে আরম্ভ করি।' এরপর ২/২/৪৭ তারিখে ইত্তেহাদের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার আরেকটি রাজনৈতিক কার্টুন ছাপা হওয়ার সংবাদ রয়েছে।

৫/১২ তারিখের 'আত্মজীবনী' তথা রোজনামচায় মহরমের দিনে যে গোলমাল হয়েছিল তার বিবরণ পাই। সেকালে কলকাতার মহরম খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে নির্বাহ হতো। মহরমের বর্ণাঢ্য মিছিলের কথা প্রাচীনদের নিশ্চয়ই মনে আছে। মস্তো মিছিল হতো। পার্কসার্কাস থেকে মহরমের মিছিল শুরু হয়ে মানিকতলার কারবালা ট্যাঙ্কে তাজিয়া বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হতো। মিছিলে থাকত নকল দুলদুল ঘোড়া, কিছুটা রথের আদলে সুদৃশ্য তাজিয়া, তাজিয়ার অন্দরমহলে থাকত হাসান-হোসেনের নকল কবর, ৬০/৭০ ফুট উঁচু চাঁদ-তারা খচিত অসংখ্য পতাকা, লাঠিখেলা, বুক চাপড়ে 'হায় হাসান হায় হোসেন' জিগির তুলে মাতম করার দল, আগুনের ফুলকি ঝরা মশালবাহী দল, আর এই ৬/৭ মাইল দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে বসত মেলার আসর। ঐ যে পতাকার কথা বলা হলো, ট্র্যামের তার বাধ সাধত তার স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা। তাই ট্র্যাম কোম্পানির লোক একে একে খুলে দিত মাঝরাস্তার বৈদ্যুতিক তার— এগোতে নিটিশ নিটিশ ঐ সব পতাকাবাহীর দল। এভাবে মিছিলের শেষ দলটির কারবালা ট্যাঙ্কে পৌঁছুতে রাত দশটা-এগারোটা হতো বৈকি।

এই আনন্দ মিছিলে (বিষাদঘন ঘটনা হলেও বালক বয়েসে ওর বাইরের উৎসব ভাবটাই মন কাড়ত যে) বরাবরের মতো যোগ দিয়েছিলাম। নিরীহ মিছিলের ওপর হঠাৎ করেই আমাদের গড়পারের বাসার কাছের বাড়িগুলো থেকে ঢিল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মিছিলের আসবপায়ী লেঠেল ও মশালচির দল ও আবেগে উচ্ছল শোকোন্মাদ মাতমকারীর অংশটি ক্ষেপে উঠল— একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আগেই পাঠান ও টমি সেনার দল এসে পড়ায় মিছিলের যে অংশটা রামমোহন রোডের মোড়ে জড়ো হয়েছিল

আক্রমণ করবে বলে, তাদের সেনাবাহিনী নিরস্ত করল। ওদের রাইফেলের নলগুলো সকলের বুক স্পর্শ করে গেল। বুক নয়, যখন আমার পেট ছুঁয়ে গেল টমির শীতল নলটা, আমি আধেধক মরেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির ফলে মানিকতলায় দাঙ্গাটা ভালো করেই বাঁধল। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না মিছিলের ওপর গায়ে পড়ে ঢিল ছোঁড়ার মাহাত্ম্য কোথায় রয়েছে। মিছিলের ক্ষিপ্ত একটা দল কিছু বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দাউ দাউ আগুনের ঝলসানো আলোয় হতবাক আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।

দিন যাচ্ছে দাঙ্গা চলছে। ভুঁড়ি ফাঁসানো, চোখ উপড়োনো, বুক খাবলানো, ঘরে আগুন দেয়া আর লুটপাটের কমতি নেই। গা-সওয়া হয়ে গেছে সব। আরেকটা ব্যাপার যোগ হলো। একটা প্রতিযোগিতার রগড়। একদিন হঠাৎ কানে এলো পূরবী সিনেমা হলের কলাপসিব্‌ল্‌ গেটে তিনটে চেক লুঙ্গি[৯] পরা লাশ ঝুলছে। ছুটে গেলাম। আমাদের মিত্র স্কুলের বিপরীত দিকেই মির্জাপুর-হ্যারিসন রোডের মাথায় পূরবী। পা ওপরে, মাথা নিচে। সব কটারই ভুঁরি ফাঁসানো, একজনের দেখছি মাথাটাও থেঁতলে দিয়েছে। সনাতন গুণ্ডা-আদল নয় এমন একজন ধুতিবাবু চিৎকার করে বলল, 'আমজেদিয়ায় কাল হিঁদুর রক্ত খসিয়েছো, সা-লা— এই লাও তিনটে।'

এপারের বাঙালিরা এ দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হলো ঠিক, কিন্তু কিছু একটা করব, করা দরকার— এভাবটা কলকাতিয়া কুট্টিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো সবাই।

এরপর যা হবার তাই হলো। শুধু বৈঠকখানা-মির্জাপুর এলাকা নয়— হিন্দু-মুসলিম পল্লী ভেদে, এক এলাকায় পাঁচটি গেল তো অন্য এলাকায় দশ দশটির ধড় নামল।

আরেকদিনের কথা। দুপুরবেলা খেতে গিয়েছি পাটোয়ার বাগানে। হঠাৎ নিচে রাস্তায় হট্টগোলের শব্দে খাওয়া রেখে ছুটলাম ব্যালকনির দিকে। রেলিঙে ভর দিয়ে দেখি আমাদের পাড়ায় যে খোট্টা টোকাই ছেলেটা আসে তাকে ঘিরে জটলা। কেন? কি করেছে ও?

— সালা মালাউন কো পাকড়ো। মার বানচোৎ কো।

এসব প্রাণসেঁধনো বাক্যে এটুকু বুঝলুম ও টোকাই নয়, ওর পরিচয় ও হিন্দু, ছোটজাতের হলেও হিন্দু তো বটে। কাজেই খুনেদের চোখে ও ধর্মের বলি বই আর কিছু নয়। সমাজের এমন এক নিম্ন পর্যায়ে হতভাগা ঐ টোকাইয়ের অবস্থান যে সে-যে মানুষ, তারও যে জাত-ধর্ম আছে, এ খেয়ালই তার ছিল না। কিছুক্ষণ আগে আমার কাছেও ওর বড় পরিচয় ছিল ও টোকাই, ওর নিজেরও যে ধর্মের একটা পোশাক আছে তা ওর কেলেকিষ্টি আদুল গা বুঝতেই দেয় নি। কিন্তু খুনেদের চোখ বলে কথা। গা ফুঁড়ে ঐ পোশাকটাই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। টোকাই গলির চার মাথায় অসহায়। এ দিকে ছুটে তেড়ে আসে একদল, ওদিকে ধায় হামলে পড়ে আরেকদল— এই করে-করে ওর নিরাপদ বৃত্তের এলাকাটা ছোট হয়ে আসে। এবার চটের থলেটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে সামনের দিকে— জাপটে ধরে জীবকুলের শ্রেষ্ঠ মানবকুল। যার হাতে ছোরা চিনতে কষ্ট হলো না তাকে, আমাদের পাড়ার টিনঘেরা মাঠের জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড়— গোলাম মোহাম্মদ।[১০] কতকটা হারাকিরি স্টাইলে

টোকাইয়ে অভুক্ত হাড়জিরজিরে নতোদরে চালিয়ে দিল চকচকে ছোরা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল-আশেপাশের অনেকেই এই হোলি খেলায় সামিল হলো।

কখন মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'হায় আলাহ্! একি দেখালে তুমি!' বলেই আঁচলে মুখ লুকোলেন।

যখন নিথর সব কিছু, টোকাইকে চালান দেয়া হলো জীবিকার্জনের একমাত্র অবলম্বন ওর থলের ভেতর— অতঃপর ম্যানহোলের অতল গহ্বরে!

স্বাধীনতার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও দাঙ্গা চলছে। ১৪ই আগস্ট ঘোষিত হয়েছে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষে উদযাপিত হবে এই দিবসটি ১৫ই— একদিন পিছিয়ে। যে বাবার পিছু পিছু একদিন শেয়ালদা স্টেশনে নেবে কলকাতার বুকে কাটিয়েছি আমার শৈশব ও কৈশোরের সবচেয়ে মধুর সতেরোটি বছর, সেই বাবার ইচ্ছেতেই শেয়ালদার ঢাকা মেলে চড়ে চিরদিনের মতো বিদায় দিতে হলো কলকাতাকে। এ প্রসঙ্গে আমার ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টে[১১] লেখা কীটদষ্ট 'আত্মজীবনী'র পাতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি :

> 'যদি আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে থাকে তাহলে এই দিন সবচেয়ে বেশি মনে পড়বে আজীবন। আমার অতি স্নেহের কলকাতা ছেড়ে চিরজীবনের জন্য অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। এত বড় ব্যথা হয়ত আর কখনও পাই নি কিংবা পাব না।
>
> 'ছোটকাল থেকে এখন পর্যন্ত এই কলকাতায় মানুষ হয়েছি। কত স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকবে, আমার কত স্বপ্ন ও সাধনার স্থল ছিল কলকাতা। কিন্তু তাই ছেড়েই চলে যেতে হচ্ছে। এরচেয়ে কষ্ট আর কি হতে পারে। যা আমার লক্ষ্য, তা অলক্ষ্যে পরিণত হলো, যে পথ ধরে যেতে চেয়েছিলুম, তা বিপরীত পথে টেনে নিল, যা আমি জীবনে ভাবতেও পারি নি, তা বাস্তবে রূপান্তরিত হলো।
>
> 'যাইহোক, এইদিন মুসলমানদের পক্ষে ও হিন্দুদের পক্ষে ঐতিহাসিক দিবস। কারণ এই দিনই ব্রিটিশ তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। আজ স্বাধীনতা দিবস। তবে আমি এতে যোগ দেব না স্থির করেছি। কারণ আছে। তা আমার মনেই থাক। প্রকাশ করতে চাই না।'

সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ফলে এমনিতেই মনের পটে আঁচড় কেটে চলেছিল গত এক বছর থেকেই, পাকিস্তান আন্দোলনে মুকুল ফৌজের ভূমিকা তাতে ইন্ধন কম জোটায় নি। তাইতো আত্মজীবনীতে ১৫ই আগস্টকে 'মুসলমানদের পক্ষে ও হিন্দুদের পক্ষে ঐতিহাসিক দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আর ঐযে স্বাধীনতা দিবসে যোগ না দেওয়ার অঙ্গীকার ও অভিমান, এর অন্দরমহলের গূঢ় কথাটি হলো কলকাতাকে ছেড়ে যাওয়া এবং ঢাকা নয় 'অন্যত্র' চলে যাওয়ার বেদনা— স্বাধীনতার কারণেই কলকাতা ত্যাগ করতে হচ্ছে, কাজেই, সেই স্বাধীনতার কপালে আগুন, সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।[১২]

ফিরে আসি ১৪ই আগস্ট প্রসঙ্গে। ২/৩ দিন আগে থেকেই গোছগাছ চলছিল— পালঙে, খাটে, আলনায়, চেয়ারে, টেবিলে, পোর্টমেন্টোয় ক্রমিক নম্বর পড়ছিল, তালিকা হচ্ছিল জিনিসপত্রের— ট্রেনে জাহাজে করে যাবে ঢাকা— পূর্ব বাংলার রাজধানীতে। সব গোছগাছ ঠিক। ১৩ই সরকারি ট্রাক এসে নিয়ে গেল সব। ১৪ই আগস্টের ভোরবেলা নাস্তা

খেতে গিয়েছি পাটোয়ার বাগানে— হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল : 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই— ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর নাই' যুগলধ্বনিতে পল্লীটা যেন হেসে উঠল। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সে এক অপূর্ব দৃশ্য— হিন্দু-মুসলমানে খুব কোলাকুলি হচ্ছে, চারদিক আলো করে মিলনের বাণী সমৃদ্ধ ব্যানার এবং জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। তবে কলকাতিয়া মুসলমানদের চোখেমুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া— কিছুক্ষণ আগেও যে-বুকে চাকু ঢুকিয়েছে, সেই বুকের উষ্ণতা এখন অন্যরকম ঠেকছে— 'কলকাত্তা ভি চলে গায়া?'— অর্থাৎ নেতাদের আশ্বাসবাণী তাহলে সব ধোঁকা? 'তব এত্না লোহু বহায়া কিঁউ?'— তাহলে কেন এত রক্ত বওয়ালাম? কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর যে কুটিল নেতাদের কাছে চাওয়া হয়েছে তারা ততক্ষণে ঢাকার নিরাপদ আশ্রয়ে।

কলকাতাকে একবার শেষবারের মতো ঘুরেফিরে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। ট্র্যামে চেপে একবার গড়ের মাঠটা ঘুরে আসব ভেবে রাজাবাজার ট্র্যাম ডিপোয় পা বাড়িয়েছি— চারদিকে লোকেলোকারণ্য— শেকল ছেঁড়ার আনন্দে সবাই যেন পাগলপারা। কন্ডাকটর টিকিট চাইতে কেউ টিকিট দেবে না বলে পণ করলে, বলে কিনা— 'আজ দেশ স্বাধীন, আজ টিকিট কি বাওয়া?"[১৩] কন্ডাকটার অগত্যা হাঁটুভাঙা দ। বিনি টিকিটে গড়ের মাঠ ভ্রমণ, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মন খারাপ ভাবটা দূর হলো। সারা কলকাতার লোক ঝেটিয়ে সব রাস্তায় নেবে পড়েছে। হাসছে গাইছে নাচছে— এ এক অভিজ্ঞতা বটে। অনেক দিন, গোটা এক বছর হাত-পা গুটিয়ে প্রাণটা হাতে করে কাটিয়ে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গিয়েছিল— আজ সব কিছুর শুভ সমাপন। এসপ্লানেডের মোড়ে নেবে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করে, মানুষের ভিড়ের স্রোতে যখন ক্লান্ত, তখন সেন্ট্রাল সিনেমা হলে একটু বিশ্রাম নেব বলে ঢুকে পড়লাম। দেখা হলো দিলীপকুমারের 'জুগনু'। শো ভাঙলে ট্রামে চেপে মির্জাপুরের মোড়ে নেবে শেষবারের মতো স্কুলের সামনে গেলাম। স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব তখন তুঙ্গে। বাজি পুড়িয়ে নেচেগেয়ে রাস্তা জুড়ে সবাই আনন্দ করছিল। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ।

— মীজানুর যে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি বিভাস স্যার।[১৪] স্কুলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে।

— কিরে, কি ঠিক করলি? যাবি, না থাকবি?

— চলে যেতে হবে স্যার।

— তোদের বাবা কি বলেন?

— বাবাই তো—

— অ। তো কবে যাচ্ছিস?

— আজকেই স্যার। দশটায় ট্রেন।'

— হায় ভগবান! তুই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? যা, তোর মা-বাবা হয়তো ভাবছেন।

নমস্কার জানিয়ে বাড়ি ফেরামাত্রা মার বকুনি, বাবার চোখ রাঙানি। নতমুখে সব মেনে নেয়া ছাড়া কি বলার থাকতে পারে আমার।

বাড়ি ছাড়ার আগে দেয়ালে এ'কটা কথাই আঁচড় কাটতে পারলুম শুধু :

বিদায় কলকাতা!

তথ্যপঞ্জি

১. বড়লাটের অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদানের অপরাগতার পেছনে পূর্বাপর অনেকগুলো ঘটনাই পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে বলে আমার ধারণা। ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই জুনের ঘোষণায় জিন্নাসহ ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার কথা ছিল। এতে লীগের ৫ জন মুসলমান, কংগ্রেসের ৬ জন (১ জন তপশিলী সম্প্রদায়ের সদস্যসহ) হিন্দু সদস্য ছাড়াও শিখ, পার্শী ও খিস্টান সম্প্রদায়ের এক একজন করে সদস্যের নাম ছিল। কিন্তু যেহেতু লীগের সংখ্যাসাম্য নীতি ভঙ্গ করে কংগ্রেসের ৬ জন সদস্য নেয়া হয়েছিল এবং ২৪শে আগস্ট বড়লাট নেহেরুর নেতৃত্বে ১৪ জনের অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যভার গ্রহণের যে ঘোষণা দিলেন, তাতে বড়লাট মনোনীত যে তিনজন মুসলমান সদস্যের নাম ছিল তা লীগের মতে 'মুসলিম-ভারতের শ্রদ্ধা বা আস্থাভাজন নন' এবং ক্যাবিনেট মিশনের 'এ বি সি' পরিকল্পনার রদবদলের অধিকার ও স্বাধীনতা কংগ্রেসের রয়েছে বলে ১০ই জুলাই জওহরলাল জানালেন, তখন জিন্না তথা লীগের পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। 'জিন্না বললেন যে ইংরেজরা দেশে থাকাকালীনই এবং হাতে ক্ষমতা আসার পূর্বেই কংগ্রেস যদি এতবার তার ভূমিকা বদলাতে পারে, তাহলে ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যে আবার তার মত বদলাবে না এবং পুনর্বার জওহরলালের বিবৃতিতে ব্যক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে না, সে ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের কাছে নিশ্চয়তা কোথায়?' (জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২৩৩)

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে বলা হলো, 'আপোষ রফা ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বার করার মুসলিম-ভারতের যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে ভারতবর্ষে এক বর্ণহিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।'.... আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অবিলম্বে এক স্বাধীন ও পূর্ণতঃ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির কম কোনো কিছুতে ভারতের মুসলমানরা শান্ত হবেন না এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদি বা স্বল্পমেয়াদি কোনো রকম সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া অথবা কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের তাঁরা বিরোধিতা করবেন।.... ইংরেজ শাসকের আচরণের প্রতিবাদ এবং তার প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে এই কাউন্সিল মুসলমানদের অবিলম্বে বিদেশি সরকার প্রদত্ত উপাধিসমূহ বর্জন করার আহ্বান জানাচ্ছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫)

** এখানে একটা ব্যক্তিগত ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ঐযে বিদেশি সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জনের আহ্বান— আমরা দু'ভায়েতে তাতে সাড়া দিয়েছিলুম মনে পড়ে। সঙ্গতকারণেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী বড় ভাইয়ের এবং অষ্টম শ্রেণির পড়ো এই অধমের সরকার প্রদত্ত কোনো উপাধি থাকার কথা নয়। আমাদের ছিল পারিবারিক উপাধি— (পিরানাপীর) খোন্দকার। অগ্রজের পরামর্শে আমরা তা-ই বর্জন করলাম। বড় ভাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের তালিকায় খোন্দকারহীন নাম দেখে বাবার কি ক্ষোভ। পরামর্শ না নিয়ে এমন একটা কাজ করায় তাঁর ক্ষোভ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

২. কিন্তু অচিরেই শুধু কংগ্রেস নয়, মুসলিম লীগের মধ্যেই সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অনেকেই অনাস্থা আনেন। এতে জিন্নার মদদ ছিল। ৭/২/৪৭ আমার ডায়েরিতে চাঁদা তুলে সোহরাওয়ার্দীর 'ইত্তোহাদ' পত্রিকা কিনে সাড়ম্বরে পোড়ানোর বিবরণ পাই। বেশ লোক জমা হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সভা আহ্বান করা হয়েছিল— কিন্তু ওটা আগেই দেখলে চলে গিয়েছিল ওঁর সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে। সেখানে ধ্বনি ছিল— 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ'! 'ফজলুল হক মুর্দাবাদ।' বেকার হোস্টেলে চলছিল অল বেঙ্গল মুসিলম স্টুডেন্টস লীগের হক-পক্ষের সভা। ওখানেকার শ্লোগান উল্টোটাই— 'ফজলুল হক জিন্দাবাদ! সোহরাওয়ার্দী মুর্দাবাদ'! এই যে রাজনীতির খেলা এর পেছনে ছিল জিন্নার কূটনীতি। ৮ই সেপ্টেম্বর জিন্না হক সাহেবকে 'মুসলমানদের প্রাণ দিয়ে সেবার' যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় বিদ্রোহী সোহরাওয়ার্দীর ভাগ্যে 'মুর্দা' হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু রাজনীতির লীলা বোঝা দেবতারও অসাধ্য— শেষ পর্যন্ত দুধের সরটা কিছু জটেছিল নাজিমুদ্দিনের ভাগ্যে। পাকিস্তানের জন্মের পর পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রীত্বের পদটা কিন্তু জুটেছিল ঢাকার নবাব পরিবারের এই সন্তানের অদৃষ্টে!

৩. হায়! যাদের সাহায্যের জন্যে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলাম, সেই বিহারিরাই মুক্তিযুদ্ধে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের প্রতিপক্ষ! মীরপুর ও অন্যান্য বধ্যভূমিতে বিহারীদের বর্বরতা নাৎসিদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়েছিল।

৪. হঠাৎ আরেকটি ডায়েরিতে দেখছি কথাটা আংশিক সত্য। লেনিনের প্রথম হওয়ার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। তবে রিলিফ ফান্ডে ৫৭৮ টাকা তোলার জন্য ওকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে যে মেডেল দিয়েছিল সেটা সঠিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ওর সংগ্রহ ছিল ৭৮ টাকা টাকা। চুয়াডাঙার এক আত্মীয় ওকে ৫০০ টাকা পাঠালে পরে সে ঐ অঙ্ক নিজ সংগ্রহের সঙ্গে এক করে দেখায়। বাগবান ভাই এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওর নাম খারিজ করার উপক্রম করেছিলেন। আমার সংগ্রহ ছিল ৫৮ টাকা। কৃতিত্বের জন্য 'আজাদ' এ ছবি ছাপা হয়েছিল।

৫. সেকালে মুসলিম পরিচালিত রেস্তোরাঁ-চেইন। মির্জাপুর-আপার সার্কুলার রোড সঙ্গমে, জাকারিয়া স্ট্রিট ও ফ্রিস্কুল স্ট্রিট-কর্পোরেশন রোড এলাকায় এই রেস্তোরাঁর শাখা ছিল। এদের বিরিয়ানির খুব খ্যাতি ছিল।

৬. বিষ্টু কাকা ঐ গড়পারের গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাদের বাড়ির নিরাপত্তার জন্যে সার্বক্ষণিক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. এ বাড়িতেই আমার ছেলেবেলার সখা সুন্দর থাকত। ওর বাবা ছিলেন জিপিও-র পোস্ট মাস্টার। যে ঘরটাতে মা ঠাঁই নিলেন ওটা ছিল সুন্দরদের মা-বাবার ঘর। বাড়ির নিচতলায় ছিল কর্পোরেশন স্কুল। দোতলা-তেতলায় থাকতেন স্কুলের শিক্ষক তথা কবিদ্বয়— খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও বেনজির আহমদ দম্পতি। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সখ্য ছিল। এই স্কুলে কবি বেগম সুফিয়া কামালও কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

৮. এম্পায়ার হলে (এখন যা রক্সি) অশোক কুমার-লীলা চিটনিস অভিনীত 'কিসমত' ছবির একাদিক্রমে সাড়ে তিন বছর চলার সর্বকালীন রেকর্ডের পর এই 'রতন' ছবিটি আড়াই বছরের রেকর্ড গড়েছিল।

৯. সেকালে এ ব্যাপারটা ছিল। মুসলমানদের মধ্যে চেক এবং হিন্দুদের মধ্যে অনলংকৃত লুঙ্গির প্রচলন ছিল। পোশাকেও সাম্প্রদায়িকীকরণের কি এক অদ্ভুত ব্যবস্থা!

১০. পরে কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিঙের বিখ্যাত খেলোয়াড়।

১১. তারিখটার মধ্যে গোলমাল আছে বলে মনে হয়। কারণ আমার বেশ মনে পড়ে আমরা ১৪ই আগস্ট রাত দশটায় শেয়ালদা ত্যাগ করি।

১২. অথচ বেশ মনে পড়ে স্বাধীনতার দিনকাল যত ঘনিয়ে আসছিল হক সাহেবের (এ. কে. ফজলুল হক) দম্ভোক্তি ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল : 'পার্টিশন হলেও কলকাতার সূচাগ্র ভূমি ছাড়বো না' কিংবা 'বাংলা যদি বিভক্ত হয়, কলকাতাও বিভক্ত হবে' কিংবা 'বিভক্ত কলকাতাও সম্ভবপর না হলে কলকাতা হবে আন্তর্জাতিক শহর' ইত্যাদি ইত্যাদি।
'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় তো কলকাতার কোন্ কোন্ অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে তা নিয়ে মানচিত্র পর্যন্ত ছাপা হয়।

১৩. এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঐ দিন চায়ের দোকানে মালিক বরাবর চা-পায়ীদের কাব্যিক আবদারের কথা : 'দেশ স্বাধীন! এক কাপ চা দিন!'

১৪. বিভাসচন্দ্র মিত্র। মিত্র স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বেশ্বর মিত্রের পৌত্র। মিত্র পরিবারের শেষ মিত্র-শিক্ষক তথা হেডমাস্টার। এর আগে ওঁর বাবা নির্মল চন্দ্র মিত্র এবং বড়দা সুহাসচন্দ্রও প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। পরে ঢাকা বেড়াতে এলে (১৯৮৫) তিনি তাঁর বন্ধু সম্প্রতি প্রয়াত রমজান আলী খান মজলিসের বাড়িতে উঠেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন বড় আনন্দে কেটেছিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ভারতীয় উপমহাদেশের কলকাতা মহানগরীতে সবচেয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুসহ আবাল বৃদ্ধবণিতা। সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলার ভয়াবহতা ও রক্তের হোলিখেলার নারকীয়তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক মীজানুর রহমান। 'কৃষ্ণ ষোলই' তারই একটি বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নির্মোহ কাহিনিবিন্যাস। এটি একটি প্রামাণিক দলিলও বটে।

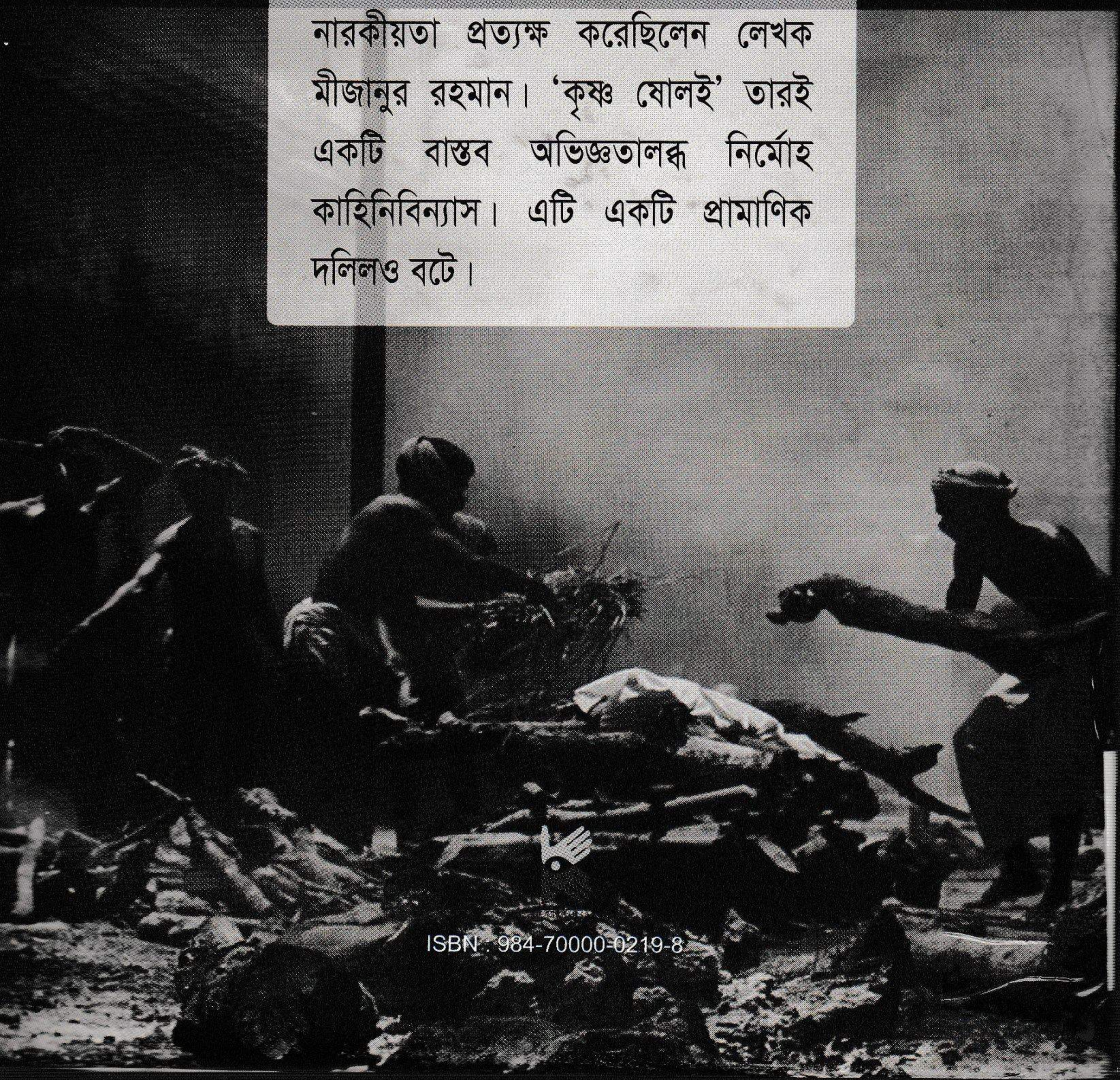

ISBN : 984-70000-0219-8